পাতলা মেঘ

লাড্‌লী বেগম

॥ উৎসর্গ ॥

ত্রিশের দশকে আসানসোল ই. আই. আর. স্কুলে যে-শিক্ষক আমাকে ভারতেতিহাসের অন্ধগলিতে পথ খুঁজে নিতে প্রথম সাহস জুগিয়েছিলেন,

এবং

স্কুল-ক্রিকেট-টীমে যিনি বরাবর ছিলেন আমার সঙ্গে ওপেনিং পার্টনার, প্রথম ওভারের ছয়টি 'বল' 'ফেস' করে খেলায় আমাকে সাহস জুগিয়েছিলেন,

সেই পড়া-খেলার সঙ্গী অশীতিপর তরুণ বন্ধু অধ্যাপক

শ্রীসতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে

শ্রীচরণাশ্রিত

নারায়ণ সান্যাল

১।১।৮৬

'লাডলী বেগম'-এর অগ্রজ (প্রকাশের ক্রমানুসারে):

† মুশকিল আসান, বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প, বল্মীক, † গ্রাম্যবাস্তু, † পরিকল্পিত পরিবার, বাস্তবিজ্ঞান, ব্রাত্য, দশেমিলি, মনামী, † অরণ্যদণ্ডক, দণ্ডকশবরী, অলকনন্দা, মহাকালের মন্দির, * নীলিমায় নীল * পথের মহাপ্রস্থান, সত্যকাম, * অন্তর্লীনা, অজন্তা অপরূপা, * তাজের স্বপ্ন, * নাগচম্পা, * নেতাজী রহস্য সন্ধানে, * আমি নেতাজীকে দেখেছি, * পাষণ্ডপণ্ডিত, * কালোকালো, জাপান থেকে ফিরে, আবার যদি ইচ্ছা কর, কারুতীর্থ কলিঙ্গ, * গজমুক্তা, আমি রাসবিহারীকে দেখেছি, * বিশ্বাসঘাতক, হে হংসবলাকা, সোনার কাঁটা, * মাছের কাঁটা, অশ্লীলতার দায়ে, * লালত্রিকোণ, আজি হতে শতবর্ষ পরে, অবাক পৃথিবী, নক্ষত্র লোকের দেবতাত্মা, * পঞ্চাশোর্ধ্বে, * পথের কাঁটা, চীন ভারত লঙ মার্চ, হংসেশ্বরী, প্যারাবোলা স্যর, ঘড়ির কাঁটা, * কুলের কাঁটা, আনন্দস্বরূপিণী, * লিগুবার্গ, তিমি-তিমিঙ্গিল, কিশোর অমনিবাস, ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন, গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা, অরিগামি, লা-জবাব দেহ্‌লী অপরূপা আগ্রা, * না-মানুষের পাঁচালী, সুতনুকা একটি দেব-দাসীর নাম, সুতনুকা কোন দেবদাসীর নাম নয়, * রাস্কেল, * রোস্ত্যাঁ, * ষাট-একষট্টি, মিলনান্তক, * নাকউঁচু, * ডিজনেল্যাণ্ড, উলের কাঁটা

'লাডলী-বেগম'-এর অনুজ (প্রকাশের ক্রমানুসারে):

পুরবৈরা, প্রবঞ্চক, * অআক খুনের কাঁটা, পয়োমুখম্, * না মানুষী বিশ্বকোষ, সারমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা, অচ্ছেদ্যবন্ধন ছৌবল,

'লাডলী-বেগম'-এর সম্ভাব্য অনুজ (প্রকাশের অপেক্ষায়):

* ছয়তানের ছাওয়াল, হাতি আর হাতি, * না-মানুষী বিশ্বকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড)

---

* তারকা-চিহ্নিত পুস্তক আমাদের প্রকাশনা। † চিহ্নিত পুস্তক নিঃশেষিত

॥ কৈফিয়ৎ ॥

"লা-জবাব দেহ্‌লী—অপরূপা আগ্রা"—গ্রন্থ রচনার সময় মুঘল-যুগের ইতিহাস কিছুটা ঘাঁটতে হয়েছিল। তখনই এই মহিমময়ী নারীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আমার মনে হয়েছিল মুঘল-ইতিহাসে এই মিষ্টি বাঙালী মেয়েটি : কাব্যে উপেক্ষিতা। দ্বিজেন্দ্রলাল 'নূরজাহান' নাটকে নায়িকার কন্যার প্রসঙ্গে এসেছেন; সেখানেও সে পার্শ্বচরিত্র মাত্র। সেখানে নামটা ছিল লায়েলী। আমি ইংরাজি ইতিহাসকারের নামটিই গ্রহণ করেছি।

তা সে যাই হোক, লাড্‌লিবেগমের ইতিহাস খুঁজতে রীতিমত বেগ পেতে হল। যে সব পূর্বসূরীর সাহায্য নিয়েছি তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছি পরিশিষ্টে।

স্বীকার্য : লাডলিবেগম এ-গ্রন্থে আদ্যন্ত 'উত্তম-নারী'তে ('চেয়ারম্যান' ইদানিং 'চেয়ার-পার্সেন' হয়েছেন; তাহলে বৈয়াকরণিকেরা 'উত্তম-পুরুষ' শব্দটা বদলাচ্ছেন না কেন? 'উইমেন্স লিব্‌'-এর ধ্বজাধারিণীরা কী বলেন?) তাঁর কোনও আত্মজীবনী নেই, অন্তত আমি খোঁজ পাইনি। ফলে উপন্যাস ও ইতিহাস অংশ সাজাতে আমাকে সবটা নায়িকার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে ও দেখাতে হয়েছে। এখানে স্বীকার করে যাই, তাই বলে ইতিহাসকে আমি সজ্ঞানে কোথাও অতিক্রম করিনি। আজি-আম্মা, মীনাবহিন, রুস্তম প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্র বাদে সব চরিত্রই ঐতিহাসিক। ইতিহাস তাঁদের যে চোখে দেখেছে, অন্তত যা দেখা উচিত, তাই দেখেছি ও দেখিয়েছি। অভিরাম স্বামী, মতিবিবি প্রভৃতি দু-একটি চরিত্র সাহিত্য সম্রাটের কাছ থেকে ধার নিয়েছি মাত্র।

গ্রন্থের এখানে-ওখানে যে ছবিগুলি আছে তা স্নেহাস্পদ শ্রীমান গৌতম দাশগুপ্তের কেরামতি। চিত্রগুলি মুঘল মিনিয়েচার থেকে অনুকৃত। অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীর রঙিন ছবি, টেম্পারা পদ্ধতিতে আঁকা।

নাম শুনে আমাকে চিনতে পারছেন না, নয়? কেমন করে চিনবেন? আমি যে মুঘল-কাব্যে উপেক্ষিতা—উর্মিলা যেমন ছিল বাল্মীকির চোখে, পত্রলেখা বাণভট্টের দৃষ্টিতে। অথচ আমি কিন্তু খাঁটি বাঙালী! 'জীবন'-এর মতো আমিও বলতে পারতুম—লাডলী "আমার নাম, মানকরে মোর ধাম জিলা বর্ধমানে/এতবড় ভাগ্যহত দীনহীন মোর মত নাহি কোনখানে।" আজ্ঞে হ্যাঁ, বর্ধমান জেলার মানকর গ্রামের এক অস্থায়ী সৈন্যশিবিরে সর্বপ্রথম এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ ভরা পৃথিবীতে দু'চোখ মেলেছিলুম—অন্তত আমার ধাত্রী আজি-আম্মা তো তাই বলে। তবে 'দীনহীন' বল্‌লে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। দীনহীন আমি নই—আমার আব্বাজান তখন ছিলেন মুঘলসম্রাট শাহ্‌-য়েন-শাহ্‌ আকবর বাদশাহ্‌র অধীনে বর্ধমানভুক্তির এক জায়গীরদার। বাঙালীর মেয়ে, তাই সোনার চামচ নয়, দুধ খেয়েছি সোনার ঝিনুকে। একটু বড় হয়ে ফুলকাটা সোনার রেকাবিতে পেস্তা-বাদাম-আঙুর-আপেল। আরও বড় হয়ে রূপার থালায় বিরিয়ানি আর মুর্গ্‌মসল্লম্‌। আমার আব্বাজানের স্বহস্তে পাকানো। হ্যাঁ, মা নয়, বাবা। মা যে উনানের ধারেকাছে ভিড়ত না—দুধে-আল্‌তা রঙ কালো হয়ে যাবে না? তাছাড়া তার সময় কই? আগুল্‌ফ না হলেও হাঁটুতক্‌ লম্বা চুল আঁচড়ানো আছে, গাধার দুধে স্নান করা আছে, মুখে হাবি-জাবি মেখে পটের বিবিটি সাজার নানান আয়োজন আছে! তারপর আছে—তানপুরা, সেতার, এস্‌রাজ; আবার ওদিকে রঙ-তুলি-গজদন্তের পাটি। কবিতা লেখার হাজার সরঞ্জাম তো আছেই। পাকশালার দিকে ভিড়বার তার সময় কোথা? আর বাপির রান্নার হাত ছিল যাকে বলে—লা-জবাব! আমার বাল্যকালে সে অবশ্য পাকঘরে ঢুকবার সময়ই পেত না, দিবারাত্র ব্যস্ত থাকত নানান কাজে। তবে আজি-আম্মার মুখে শুনেছি—আগ্রায় থাকতে আব্বাজান নিত্যি রান্না করত। সকালে-রাত্রে। নানান পদ। বর্ধমানে আসার পরেও মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ত পাক ঘরে। নওরোজ, বকর ঈদ বা মিলাদ-সরিফে পাঁচ-মেহ্‌মান আমন্ত্রিত হলে। সেদিন সে খুলে রাখত তার ভারি জোব্বা, মখ্‌মলের জরি-তোলা আঙ-রাখা। মাথায় জড়াতো লাল-গামছা! সখ্‌ করে দু-পাঁচ পদ রান্না করত। সারাহ্‌-বাবুর্চি—সসম্মানেই শুধু নয়, সসঙ্কোচে সরে দাঁড়াতো। এটা শুধু কিলাদারের প্রতি সম্মান

জানানো নয়, ঐ বড় বাবুর্চি জানত—কৈশোরকালে বর্ধমানের এই জায়গীরদার ছিলেন স্বয়ং পারস্য সম্রাট শাহ্ দ্বিতীয় ইস্‌মাইলের 'সফরচি'! দুনিয়ার সেরা রাঁধুনিদের কাছ থেকে ঐ রন্ধনবিদ্যাটা আয়ত্ত করেছিলেন তিনি। আম্মাজানকে মাঝে-মাঝে রসিকতা করে বলতেন, কী সব ছবি-আঁকা কবিতা-লেখা নিয়ে সময় নষ্ট করছ; দুনিয়ার সেরা রস রসনায়। রান্নাটা শিখে নাও আমার কাছে; তাহলে বুড়ো হয়ে গেলে তোমার হাতের পাঁচ-পদ পরখ করবার সুযোগ পাব।

মা হেসে বলত, মরণ! সে ইচ্ছা থাকলে ভাল দেখে একটা রাঁধুনির মেয়ে সাদি কর না বাপু। সতীন নিয়ে ঘর করতে আমার তো আপত্তি নেই!

আব্বাজানও হেসে বলত, জানি তুমি তাই চাও! তাহলে তালাক চাইবার একটা অজুহাত পাও!

মা আগুন-ঝরা চোখে বাপির দিকে তাকিয়ে থাকত।

পিতৃ পরিচয় দিলেই কি চিনতে পারবেন আমাকে? মনে তো হয় না!

আমার আব্বাজানের নাম: আলিকুলি বেগ্ ইস্তাজলু। চিনতে পারলেন না তো? অথচ মায়ের নামটা উচ্চারণ-মাত্র আমাকে সনাক্ত করবেন। যেন আমি আমার হতভাগ্য বাপের আদুরে দুলালী নই,—মায়ের উপেক্ষিতা আত্মজা!

কিন্তু না! মায়ের নামটা এখনি শোনাব না। কোন অভিমান বশে নয়; তাঁকে আমিও প্রাণ দিয়ে ভালবাসতুম; তাঁর মেহ্‌দি-রঞ্জিত রাতুল চরণেই তো বিকিয়ে দিয়ে এসেছি গোটা জিন্দেগী—তার চেয়েও বড় কথা, গোটা জওয়ানী। অভিমান থাকলে কবেই তো তাঁকে ত্যাগ করে বলতে পারতুম: 'আপনি বুঝিয়া দেখ, কার ঘর কর'!

আমি তা করিনি। তবে কেন তাঁর নামটা এখনই বলে দিচ্ছি না? সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে। কারণ: আজ, এই প্রথম, আপনাদের শুধু আমার নিজের কথা শোনাতে বসেছি। যে-কথা লিখতে ভুলেছে ইতিহাস। তাঁর কথা তো আপনারা সবাই জানেন। এখন, এই মুহূর্তে তাঁর নামটা উচ্চারণমাত্র আপনারা সবাই লাফ্ দিয়ে উঠ্‌বেন—'ওমা, তাই নাকি! তুমি তাঁর মেয়ে? এতক্ষণ বলনি কেন গো? তাঁকে তো ভাল রকমই চিনি। তোমার মায়ের নামটা কতবার পড়েছি ইতিহাসের পাতায়। ট্রয়ের হেলেন, মিশরের ক্লিয়োপেট্রার পাশাপাশি বারেবারে উল্লেখিত হতে দেখেছি ঐ নামটা। সত্যি কথা বল্‌তে কি—রাত জেগে পরীক্ষার পড়া মুখস্ত করতে করতে কতবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। চোখ বুঁজে আঁকতে চেয়েছি তাঁর উর্বশী-বিনিন্দিত রূপযৌবন! বল, বল, তোমার মায়ের কথা বল, শুনি।'

হ্যাঁ। বলব। বলতে আমাকে হবেই। তাঁকে বাদ দিয়ে আমি যে কেউ

না। কিছু না। তাঁর সেই উর্বশী-বিনিন্দিত চোখ-ধাঁধানো রূপের ছটার জন্যই তো ইতিহাসে—"চিরাগ্-এ মুর্দহ্ হূঁ মৈঁ বেজগান্ গোর-এ গ্রীবাঁ কা।"

—নৈঃশব্দ ঘেরা গোরস্থানে আমি এক নিভে যাওয়া উপেক্ষিতা প্রদীপ।

হ্যাগো, তোমাদের একবারও কৌতূহল হয়নি জানতে—সেই হেলেন-ক্লিয়োপেট্রার সঙ্গে যে মহিলাটি প্রতিযোগিতা করত, তাঁর একমাত্র আত্মজার রূপটা কেমন ছিল? রূপযৌবনের কথা পড়ে মরুগ! সে মেয়েটার পোড়া কপালখানা কেমন ছিল?

অতি সযত্নে তিনি আমাকে সারাজীবন আগলে ছিলেন। একেবারে আষ্টে-পৃষ্ঠে। না, অক্টোপাস্-এর মতো নয়। অক্টোপাস্ যাকে জড়িয়ে ধরে তার সঙ্গে যে ওর খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। এ তো তা নয়। এ যে মা জড়িয়ে ধরেছে তার ছা-কে! কেমন জানেন? যেন বিচিত্রবর্ণা দুর্লভ একটি বামাবর্ত শঙ্খ! ঘিরে আছে একটা ধুক্‌পুক প্রাণকে। ঐ ধুক্‌পুক প্রাণটাই সারাজীবন বয়ে বেড়াচ্ছে জগদ্দল শঙ্খটাকে – নিজের স্বার্থেই! কারণ ঐ কঠিন বর্মটা না থাকলে প্রাণটা মুহূর্তে মুছে যাবে। অথচ মজা এই যে, ঐ অপরূপ শঙ্খটার আলিম্পন চাতুর্যেই দর্শক হয় মুগ্ধ, বিমোহিত। বংশানুক্রমে তাকে সযত্নে সাজিয়ে রাখে কাচের আলমারিতে; হিন্দু হলে লক্ষ্মীর পটের সামনে। দুর্লভ ঐ বামাবর্ত শঙ্খটা! অথচ কখনো কেউ কি ভেবে দেখে—ঐ নয়নাভিরাম কঠিন শঙ্খের আড়ালে একদিন আত্মগোপন করতে চাইত একটা ভয়চকিত অবলা জীব—ধুক্‌পুক-ধুক্‌পুক—অতলান্ত লবণাক্ত সমুদ্রের গভীরে, যেখানে অসংখ্য হিংস্র নক্র ক্রমাগত চাইত ঐ নরম তুল্‌তুলে নারী-মাংসটুকু ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে?

আমিও আমার মায়ের মহব্বতে মাতোয়ারা হয়েছিলুম। না হয়ে উপায় নেই। তাঁকে দেখলে আর চোখ ফেরানো যেত না। লক্ষ্মী-ঠাকরুণটির মতো নয়; তিনি ছিলেন 'থির বিজুলি'। চোখ ঝল্‌সে যেত! দুধে-আলতা রঙ কল্পনা করা যায়; কিন্তু হীরকখণ্ডের মতো গাত্রবর্ণ থেকে চোখ-ধাঁধানো আলোর দ্যুতি বার হচ্ছে কল্পনা করতে পারেন! তাঁর যখন পঞ্চাশ বছর বয়স তখনো তাঁর গাত্রচর্মে একতিল কুঞ্চনরেখা দেখিনি। তিনি সে অর্থে ছিলেন – যাকে বলে, অনন্ত-যৌবনা! তন্বী, শিখরিদশনা, পক্কবিম্বাধরা, মধ্যক্ষামা—কিন্তু 'শ্যামা' নন; তপ্তকাঞ্চনবর্ণা! রোদে কাঁসার থালা থেকে যেমন আলো ঠিকরায়! চোখের মণি দুটি কালো নয়, ঘন ভ্রূর নিচে একজোড়া আশ্চর্য চোখ—মণিদুটি সূর্যোদয়ের আগে পশ্চিমাকাশের মতো সুনীল। মাথার চুল ছিল ঢাকাই মস্‌লিনের মতো নরম; আর পার্বত্য

ঝরনার মতো থাকে থাকে, ছোট ছোট ঢেউ তুলে কাঁধের উপর ভর দিয়ে নিতম্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। সব চেয়ে আশ্চর্য তাঁর হাসিটি। যখন হাসতেন…

ঐ দেখুন! মিছেই দোষ দিচ্ছিলুম আপনাদের। মায়ের কথা উঠলে আজও আমার সব ভুল হয়ে যায়। না, মা নয়, আব্বাজানের কথা শোনাই আগে :

পারস্যরাজ্য থেকে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন এই হিন্দুস্থানে। ঠিক যেমন আর কয়েক দশক আগে এসেছিলেন আমার দাদামশাই মির্জা গিয়াসউদ্দীন মুহম্মদ বেগ, সস্ত্রীক এবং সপুত্র। শুনেছি, ঐ পথেই নাকি আমার মায়ের জন্ম। তা নিয়ে কতই না অলৌকিক কাহিনী। আমার দিদিমার যখন সন্তান জন্মালো…

আঃ! বারে বারে শুধু মা আর মা!

কী যেন বলছিলুম? হ্যাঁ, আব্বাজান সেই খাইবার-পাস দিয়ে এসে পৌঁছালেন হিন্দুস্থানে। প্রথমে এসে উঠলেন মূলতানে। প্রায় নিঃস্ব। সম্পদ বলতে একখানা তলোয়ার, আর নিজের হিম্মৎ! মুঘল সৈন্যদলে নাম লেখালেন তিনি। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সম্রাট আকবরের সেনাপতি আবদুর রহিম্ খান-ই-খানান-এর। তাঁর নাম নিশ্চয় শুনেছেন। শিশু আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁর পুত্র। আকবরের নবরত্ন সভার এক অমূল্য রত্ন। আকবর-তনয় সেলিমের গৃহশিক্ষক, মহা পণ্ডিত—বাবুরের চুঘ্‌তাই তুর্ক ভাষায় লেখা আত্মজীবনীটিকে তিনি সহজবোধ্য ফার্সিতে অনুবাদ করেছিলেন। শুধু পণ্ডিত নন, সমরকুশলী সেনাপতিও। আবদুল রহিম তখন চলেছেন তট্টা বিজয়ে। এই যুদ্ধে অপরিসীম দক্ষতা দেখালেন আব্বাজান। সেনাপতি মুগ্ধ হলেন নবাগতর বীরত্বে, পৌরুষে, ব্যক্তিত্বে এবং কর্মদক্ষতায়। যুদ্ধান্তে রাজধানীতে ফিরে এসে তিনি আলিকুলি ইস্তাজ্‌লুকে হাজির করলেন শাহ্‌-য়েন-শাহ্‌ আকবরের দরবারে। এই অসম-সাহসিক যোদ্ধার কৃতিত্বের কথা সম্রাটকে সবিস্তারে জানালেন। সেটা যেন কত হিজারত? না! হিজারতের হিসাবে আপনাদের মালুম হবে না। আপনাদের হিসাবে সেটা 1591 খ্রীষ্টাব্দ।

শাহ্‌-য়েন-শাহ্‌ জালাল-উদ্দীন আকবর গুণীর কদর করতে জানতেন। তখনই আলিকুলীকে দেওয়া হল পাঁচহাজারী মনসবদারের পদ। শুধু তাই নয়, সম্রাটের ইচ্ছায় আলিকুলীর উপর বর্ষিত হল এক বেহেস্তী মুবারকী—মুঘল সম্রাটের বিশিষ্ট মন্ত্রী মির্জা গিয়াসউদ্দীন মহম্মদ বেগের কন্যার সঙ্গে হয়ে গেল বাকদান।

গিয়াস বেগ-এর আপত্তি ছিল না; বরং আগ্রহ ছিল। তিনি অতি-চতুর রাজনীতিজ্ঞ—বুঝতে পেরেছিলেন—ঐ নবাগত দুর্মদ সমরনায়ক অনেক অনেক উঁচুতে উঠবেন। হয়তো রাজা মানসিংহের অবসরগ্রহণে তাঁর জামাইটিই হয়ে

পড়বে তামাম হিন্দুস্থানের প্রধান সেনাপতি। আমার মায়ের বয়স তখন সবে পনের। তার মতামত অবশ্য কেউ গ্রহণ করেনি। সেটা সেযুগের কেতা ছিল না। তবে সেও মুগ্ধ হয়েছিল ঝরোকার অন্তরাল থেকে ঐ পুরুষ-সিংহকে দেখে। আজি-আম্মার মুখে পরে শুনেছি—সে আমলে বেহেস্ত্-এর হুরীরাও ধন্য হয়ে যেত একরাত আলিকুলির অঙ্কশায়িনী হবার সুযোগ পেলে। অমন বৃষস্কন্ধ বীরত্বব্যঞ্জক দেহকান্তি নাকি ছিল নিতান্ত দুর্লভ। রবার্ট কাউণ্টার তাঁর দেহকান্তির বিস্তারিত বিবরণ দেননি—তাঁর বর্ণনা শুধু একটিমাত্র শব্দে বিধৃত : Indian-Apollo !

আলিকুলি বেগ্ ইস্তাজ্লুর সঙ্গে মির্জা গিয়াসের কন্যা মেহেরউন্নিসার বিবাহ সুসম্পন্ন হল 1592 খ্রীষ্টাব্দে।

প্রথম বছর সাতেক ওঁরা ছিলেন আগ্রা এলাকায়—আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রিতে। ধীরে-ধীরে ধাপে-ধাপে আলিকুলি শাহ্-য়েন-শাহ্র প্রিয়পাত্র হয়ে উঠছিলেন। বিবাহের সাত বছর পরে শাহজাদা সেলিমকে যখন মেবার অভিযানে পাঠানো হল তখন সমরাভিজ্ঞ আলিকুলিও তাঁর সঙ্গে গেছিলেন। সেখানেই নাকি আব্বাজান খালি-হাতে একটা বাঘ মেরেছিলেন—প্রাক্তন সম্রাট শের শাহ্র মতো। শাহজাদা সেলিম সন্তুষ্ট হয়ে আলিকুলিকে উপাধি দেন : শের আফকন !

খালি হাতে বাঘটাকে বধ করেছিলেন বটে কিন্তু নিজেও ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। তাই যুদ্ধান্তে আগ্রায় ফিরে এসে প্রায় তিনমাস তাঁকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়েছিল। শাহজাদা সেলিমের কী বদান্যতা—তিনি প্রতিদিন আসতেন আব্বাজানের তত্ত্বতালাস নিতে। মেহেরউন্নিসা সম্মানীয় অতিথির আদর-অভ্যর্থনায় কোন ক্রটি রাখতেন না একথা বলাই বাহুল্য। প্রথমে পর্দার আড়াল থেকে। ক্রমে ব্যাপারটা নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে পড়ার পর, প্রকাশ্যেই। তাছাড়া সম্রাট আর শাহ্জাদাদের কাছে আবার পর্দা কিসের? নওরোজ-বাজারে ওঁদের তো বে-পর্দা হয়েই বের হতে হত।

ক্রমে সুস্থ হয়ে আব্বাজান একদিন সম্রাট আকবরের দরবারে উপস্থিত হলেন। সম্রাট ওঁর রোগমুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করলেন। রসিকতা করে বললেন, তুমি বড় বেরসিক আলিকুলি। এত তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠলে কি করে? আমি রোজই ভাবি তোমার তত্ত্বতালাস নিতে যাব ; সময় করে উঠতে পারি না।

আলিকুলি কুর্নিশ করে বললেন, বান্দার দুর্ভাগ্য যে, বাদশাহ্র পদধুলি পড়ল না আমার গরিবখানায়। বান্দার দোষ নেই…

—না, না, দোষ তো তোমার নয়, দোষ ঐ খানদানি বদনটার! বাঘেই কিছু করতে পারল না, অসুখে কী করবে? কথা সেটা নয়, আমি তোমার মঞ্জিলে

যেতে চেয়েছিলাম অন্য কারণে; শুনেছি তোমার শাশুড়ি আসরফি-বেগম খুব ভাল 'ফিরনি' বানান ; না কি বল মির্জা গিয়াস ?

মির্জা গিয়াস মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, এমন কথাটা প্রকাশ্যে বলবেন না জাঁহাপনা ; এমনিতেই তার গরবে মাটিতে পা পড়ে না। কবে কখন আপনার ওয়াক্ত্ হবে বান্দাকে জানিয়ে দেবেন। ফিরনি তৈরী থাকবে। ওয়ার্না, আলিকুলি আমার গরিবখানায় থাকে না—ও আছে নিজের ডেরায়।

—ও তাই নাকি ? তাহলে সেখানেই আমার যাওয়া উচিত ছিল।

আলিকুলি পুনর্বার কুনিশ করে জানায়, আপনি স্বয়ং না এলেও শাহ্জাদাকে তো নিত্য পাঠিয়েছেন। সংবাদ নিশ্চয়ই পেতেন ?

—শাহজাদা ! কোন্ শাহজাদা ? কই আমি তো···

—শাহজাদা সেলিম। উনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমার তত্ত্বতালাস নিতে যেতেন।

দরবারের যে চিহ্নিত স্থানে যুবরাজ সচরাচর অধিষ্ঠিত থাকেন সেদিক পানে আকবর একবার তাকিয়ে দেখলেন। আসনটা শূন্য। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। সেলিম প্রতিদিন রোগীর তত্ত্বতালাস নিতে যেত ! কই কোনদিন তো সে কথা বলেনি। এমন কি, এই তো সেদিন, সেলিমের উপস্থিতিতে উনি মির্জা গিয়াসের কাছে জানতে চেয়েছেন আলিকুলি কেমন আছেন, তখনও তো সেখুবাবা কিছু বলেনি !

তৃতীয়বার অভিবাদন করে আলিকুলি দাখিল করলেন তাঁর আর্জি : সম্রাটের অনুমতি হলে তিনি মুঘল-রাজধানী ত্যাগ করে সুদূর বঙ্গদেশে গিয়ে রাজকার্যে আত্মনিয়োগ করতে ইচ্ছুক।

আকবর তাজ্জব বনলেন। তাঁর তেতাল্লিশ বছরের বাদশাহী কালে জীবনে এই প্রথম শুনছেন—কোন বুড়বক আগ্রা-ফতেপুরসিক্রির বিলাসব্যসন ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় সুদূর বঙ্গদেশে নির্বাসিত হতে চাইছে। যেমন্ লুৎফ-উন্নিসাকে যে প্রশ্নটা করেছিল—"আগ্রায় কি মানুষ নাই যে, চুয়াড়ের দেশে যাইবে ?"[1]—প্রায় সেই ধরনের কী একটা প্রশ্ন করতে গিয়েই থম্‌কে গেলেন সম্রাট। কী একটা পূর্বকথা স্মরণ হল তাঁর, যার সঙ্গে সদ্যশ্রুত বার্তাটার একটা যেন গুহ্য সম্পর্ক আছে। গম্ভীর হয়ে বললেন, এ অতি উত্তম প্রস্তাব। রাজা মানসিংহ সেখানে গেছেন কৎলু খাঁকে শায়েস্তা করতে। কলিঙ্গ তো আমাদের হাতছাড়া। তাছাড়া বারো ভুঁইয়াদের অত্যাচারও একেবারে নির্মূল হয়নি। রাজা মান-এর জন্য কিছু সৈন্য পাঠাবার কথাই ভাবছিলাম। ঠিক আছে, তুমিই সেখানে যাও তোমার বাহিনী নিয়ে। তা তোমার পরিবার।···

—শাহ্-য়েন-শাহে্র মুবারকি হলে আমি সপরিবারেই সেখানে যেতে চাই।

বাদশাহ্ যেন প্রত্যাশিত উত্তরটাই শুনলেন। স্বেচ্ছানির্বাসনের এটাই তাহলে মূল হেতু। নাহলে প্রকাশ্য দরবারে বাদশাহ্‌কে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে অশিষ্টাচরণ করবার মতো লোক আলিকুলি নয়। লোকটা মরিয়া হয়ে পড়েছে! শাহ্‌জাদা সেলিম জঙ্গলের সামান্য বাঘ নয় যে, গলা টিপে মারতে পারে। লোকটা জরু নিয়ে পালাতে চায়!

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সম্রাটের। কী হবে হিন্দুস্তানের, তাঁর অবর্তমানে?

এরপর একটা বিরাট কৈফিয়ৎ অনিবার্য হয়ে পড়ছে।

আমি যা বলব—আপনারা হয়তো তা মানতে চাইবেন না। যেহেতু জাহাঙ্গীর জমানার প্রামাণিক ইতিহাসবেত্তার সঙ্গে আমার বক্তব্য একসুরে বাঁধা নয়। ডক্টর বেণীপ্রসাদ[2] এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন ঐ গুরুত্বপূর্ণ কথাটা:

সেলিমের সঙ্গে মেহেরউন্নিসার প্রাক্‌বিবাহ যুগের মহব্বতের কিস্‌সাটা।

তাই আত্মকথায় ক্ষান্ত দিয়ে আপাতত কিছুটা ইতিহাস ঘাঁটতে বাধ্য হচ্ছি।

"বেণীপ্রসাদ যে যুক্তি দেখিয়েছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। যেমন, তিনি বলেছেন যে, যদি আকবরের জীবিতকালে মেহেরউন্নিসার বিয়ের আগে সেলিম ও মেহের-উন্নিসার মধ্যে মদনদেবের কোন হাত থেকেই থাকে–তাহলে সমসাময়িক কোন ইতিবৃত্ত বা কাহিনীতে তার নিশ্চয় উল্লেখ থাকত।...অথচ আশ্চর্য—এই ব্যাপারে এমন কেউ নেই যার বিবরণীকে সমসাময়িক বলে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।"[3]

আচ্ছা, একটা কথা আপনারা আমাকে বুঝিয়ে বলবেন? জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌র আত্মজীবনী[4] একটি সমসাময়িক দলিল—এটা নিশ্চয় মানেন? তাতে তার গর্ভধারিণী হিন্দু-জননীর নাম নেই। এ-থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসব আমরা? জাহাঙ্গীর আদৌ জন্মাননি? নাকি—তাঁর মা—অম্বররাজ ভারমলের দুহিতা মরিয়াম জমানী নয়? অথবা খুররম্ যখন ক্রীতদাস আলি রেজাকে দিয়ে নিদ্রিত জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা খস্‌রৌকে খুন করে জাহাঙ্গীরকে জানালো যে, 'দাদা কলিক-পেন'-এ মারা গেছেন, আর সমসাময়িক ইতিবৃত্তপ্রণেতা তাঁর দিনপঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করলেন —'আজ খসরৌ মারা গেল'—তখনই বা কোন সিদ্ধান্তে আসব? বাদশাহ্‌র তির্যক ইঙ্গিতে (ঠিক যেভাবে শের আফকনকে হত্যা করা হয়েছিল) যে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করা হল,[5] এটা ইতিহাস মানবে না?

প্রথমে ইতিহাস-স্বীকৃত কতকগুলি ঘটনা—যেগুলি মেনে নিয়েই বেণীপ্রসাদ

তাঁর সিদ্ধান্তে এসেছেন, সেগুলি সাজিয়ে দিই। তারপর না হয় যুক্তি-তর্ক!

এক—সম্রাট আকবরের জমানায় শের আফকন ও মেহেরউন্নিসার বিবাহ হয়েছিল 1592 খ্রীষ্টাব্দে। তার পূর্বে সেলিম অন্তত দুটি রাজকন্যার পাণিপীড়ন করেছেন—ভগবানদাস-তনয়া মানবাঈকে (1586) এবং উদয়সিংহের কন্যা মানমতীতে (1586)। তাঁর অন্তত তিনটি সন্তান জন্মেছে; যেহেতু খুররম্ বা ভবিষ্যৎ শাহজাহাঁর জন্মসাল ঐ 1592 খ্রীষ্টাব্দ।

দুই—শের আফকন সেলিমের সঙ্গে মেবার জয়ে অংশ গ্রহণ করেন। আহত হয়ে আগ্রায় ফিরে আসেন। সুস্থ হয়ে সম্রাটের কাছে আর্জি পেশ করেন—সুদূর বঙ্গদেশে সপরিবারে চলে যাবার।

তিনি—পিতৃবিয়োগান্তে সিংহাসনে উঠেই (1606) জাহাঙ্গীর বঙ্গদেশ থেকে সুশাসক এবং অসীম শক্তিশালী মানসিংহকে বিহারে বদলি করেন। স্মর্তব্য: বঙ্গদেশে তখনো রাজনৈতিক অশান্তি অথচ বিহার শান্ত। বঙ্গদেশে জাহাঙ্গীর পাঠিয়ে দিলেন তাঁর 'দুইভাই' কুৎবউদ্দীন কোকাকে। লোকটার যুদ্ধবিগ্রহের অভিজ্ঞতা অল্প, রাজ্যশাসনের অভিজ্ঞতা তার চেয়েও কম। তার একমাত্র গুণ—সে জাহাঙ্গীরের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

চার—কুৎবউদ্দীনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—শের আফকন নাকি একটি গোপন ষড়যন্ত্র করছে। কোন সূত্রে, জাহাঙ্গীর এমন একটা আশঙ্কা করলেন তাও কিন্তু কোন 'সমসাময়িক ইতিবৃত্তে' লেখা নেই। এমনকি জাহাঙ্গীরের গোপন দিনপঞ্জিতেও নয়! এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য উল্লেখ করা দরকার—আকবরের দেহান্তে শের আফকন সৈন্যবাহিনীর চাকরিতে ইস্তফা দেন এবং জায়গীর খরিদ করে গ্রাসাচ্ছাদনে আত্মনিয়োগ করেন। সবচেয়ে কৌতুকের কথা—এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রটা যে একটা বাজে অজুহাত এ সম্ভাবনার কথাও লিখেছেন ডক্টর বেণীপ্রসাদ, "The suspicion of disloyalty thrown on Sher Afkun may have been unjust." জাহাঙ্গীর কুৎব কোকাকে নাকি পাঠিয়েছিলেন ঐ তদন্ত করতে—তা সে অভিযোগ কাল্পনিক হোক বা না হোক।

পাঁচ—কুৎব বঙ্গদেশে এসে প্রথম কাজ হিসাবে ডেকে পাঠালেন শের আফকনকে তাঁর শিবিরে। শের আফকন নিশ্চিন্ত মনে একাকী রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলেন। আর ফিরে এলেন না। কুৎবউদ্দীন কোকার শিবিরের ভিতরে ঠিক কী ঘটেছিল কেউ জানে না। অন্তত ইতিহাস জানে না। জানে শুধু পরিণামটা। শিবিরের দু-তিনটি সশস্ত্র প্রহরী, রাজ-প্রতিনিধি কুৎব কোকা এবং শের আফকনের মৃতদেহ উদ্ধার করা গিয়েছিল।

ছয়—শের আফকনের বিধবা এবং কন্যাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল আগ্রায়। যদিও মেহেরউন্নিসার বাবা ইতমদ্‌উদ্দৌলা কোটিপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং মেহেরের ভ্রাতা আসফ খাঁ বিশিষ্ট সেনাপতি—তবু বিধবার আশ্রয় মিলল মুঘল হারেমে। পাক্কা চার বছর তিনি সেখানে ছিলেন—অর্থাৎ যতদিন না জাহাঙ্গীরকে সাদি করতে সম্মত হন।

এই ছয়টি সূত্র প্রামাণিক 'এভিডেন্স' হিসাবে স্বীকার করেই বেণীপ্রসাদ সিদ্ধান্তে এসেছেন—জাহাঙ্গীর মেহেরকে আদৌ দেখেননি তার প্রথম বিবাহের পূর্বে। তাঁদের কোনও গুপ্ত প্রণয় গড়ে ওঠেনি আকবরী জমানায়!

ডক্টর বেণীপ্রসাদ—তাঁর লাখো-বরিষ্ বেহেস্ত্‌বাস মঞ্জুর হোক—যে সিদ্ধান্তেই এসে থাকুন, তিনি আমাদের অনেকগুলি অনিবার্য প্রশ্নের কোন জবাব দিয়ে যাননি। একে একে সেগুলি সাজিয়ে দিই :

প্রথম কথা—মসনদে চড়ে বসেই জাহাঙ্গীর কেন রাজা মানসিংহকে বঙ্গদেশ থেকে সরিয়ে দিল? মানছি, সেলিম যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তখন রাজা মানসিংহ সম্রাট আকবরের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সেটা তো অতীত। জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ হবার পর মানসিংহ তার আনুগত্য মেনে, তার স্বার্থেই বঙ্গদেশ শাসন করছিলেন। অতীত ক্ষোভের প্রতিশোধ নেবার সময় কি মসনদে চড়েই?

দ্বিতীয়ত—শের আফকন কেন স্বেচ্ছা-নির্বাসনে রাজধানীর সুখ-সুবিধা ত্যাগ করে সুদূর বঙ্গদেশে সরে এলেন?

তৃতীয় কথা—যদি প্রতিশোধস্পৃহার প্রেরণাতেই মানসিংহকে উপদ্রুত বঙ্গদেশ থেকে নিরুপদ্রব বিহার-অঞ্চলে বদলি করা হয়ে থাকে তাহলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতে আফগান-পাঠান বারো ভুঁইঞা উপদ্রুত বঙ্গদেশে এমন লোককে কেন পাঠানো হল যার যুদ্ধ বা শাসন বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা নেই? যার একমাত্র গুণ লোকটা বাদশাহর 'দুধভাই', বিশ্বাসী ;—গোপন দুষ্কার্য সম্পাদনে দক্ষ?

চতুর্থতঃ, কুৎব যদি কোন গোপন ষড়যন্ত্রের তদন্ত করতেই এসে থাকে তবে সেটা কী জাতের ষড়যন্ত্র? তার উল্লেখ সমসাময়িক কাগজপত্রে—এমন কি জাহাঙ্গীরের দিন-পঞ্জিকাতেও নেই কেন? কেনই বা তাহলে কুৎব শের আফকনকে একাকী তার শিবিরে ডেকে পাঠাবে? আর শের আফকনই বা কেন কোন সন্দেহ না করে বিনা দেহরক্ষীতে নির্ভয়ে তার শিবিরে উপস্থিত হবেন? সেখানে এমন কী বিষয়ে আলোচনা হতে পারে যাতে তিন-চারটি প্রাণী গোপন শিবিরে নিহত হন? কুৎব এবং আফকন হত হয়েছিলেন—কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী

অনেকেই জীবিত ছিলেন এটা আশা করা সঙ্গত। তা সত্ত্বেও সেই শিবির অভ্যন্তরে কী ঘটেছিল তা সমসাময়িক নথীপত্রে উল্লেখিত হল না কেন?

আর সবচেয়ে বড় কথা—যে কথার কৈফিয়ৎ না দিয়ে সিদ্ধান্তে আসা হিমালয়ান্তিক ভ্রান্তি হয়েছে পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর বেণীপ্রসাদের—শের আফকনের দুর্ঘটনা-জনিত (?) মৃত্যুর পর কেন তার বিধবা পিতৃগৃহে ফিরে এল না? অথবা কেন নয় তার ভ্রাতার আবাসে? দুজনেই কোটিপতি, দুজনেই মুঘল-দরবারে অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এবং দুজনেরই সদ্ভাব বজায় আছে মেহেরউন্নিসার সঙ্গে! কেন বিধবাকে বন্দিনী করা হল মুঘল-হারেমে?

নাকি বন্দিনী নন? সম্মানিত মেহ্‌মান? সীতা দেবী যেমন ছিলেন রাবণ রাজার অশোক-কাননে?

আমি যা শুনেছি, জেনেছি, এবার তাই লিপিবদ্ধ করি। এটা ইতিহাস নয়, আমার স্মৃতিচারণ।

আজ্ঞে না, মেহেরউন্নিসার প্রাক্‌বিবাহ-জীবনের রোমান্স আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়। তখনো আমার জন্ম হয়নি। সেটা শুনেছি অনেকের মুখে। সবচেয়ে বেশি করে আজ্জি-আম্মার কাছে। অনেক পরে। বয়ঃপ্রাপ্তির পরে।

আজ্জি-আম্মা আমার 'দুধ-মা'। সে-আমলে ধরানা ঘরের মেয়েরা সন্তানকে দুগ্ধপান করাতো না। নিযুক্ত হত দুগ্ধবতী ধাত্রী। সম্রাট জাহাঙ্গীরের 'দুধ-মা' যেমন ছিলেন আকবরের গুরু, শেখ সেলিম চিস্তির কন্যা—যাঁর পুত্র কুৎবউদ্দীন কোকা হচ্ছেন জাহাঙ্গীরের 'দুই-ভাই'।

আজ্জি-আম্মা জন্মসূত্রে হিন্দু। রাজপুত। মুঘল হারেমে এসেছিলেন উদয়পুরী বেগমের সঙ্গে—অর্থাৎ শাহজাদা-গর্ভধারিণীর খাশ্‌ বাঁদী হিসাবে। একজন মুসলমানকে বিবাহ করে ধর্মান্তরিতা হন। পরে আব্বাজানের সঙ্গে আগ্রা থেকে বর্ধমানে চলে আসেন। কারণ তখন আমার মায়ের ছিল সন্তান সম্ভাবনা। আমার জন্মের একমাস আগে তাঁর একটি পুত্র-সন্তান জন্মায়—আমার 'দুধভাই' রুস্তম শেখ। বাল্যকালে আমার জীবন ছিল ঐ আজ্জি-আম্মা আর রুস্তম-ভাইকে ঘিরে। মায়ের দেখা দিনান্তে পেতুম কি না সন্দেহ। মায়ের যে নানান বাতিক—তার সময় কোথা? তস্‌বির-আঁকা শেখাতে, গান শেখাতে, আরবী-ফার্সি পড়াতে দণ্ডে-দণ্ডে আসতেন গৃহশিক্ষকেরা। বাকি সময় তিনি মত্ত থাকতেন সঙ্গীত-চর্চায়, কাব্য-রচনায় অথবা তসবির-আঁকায়। এ-ছাড়া দীর্ঘ প্রসাধন তো আছেই।

মেহেরউন্নিসার প্রাক্‌বিবাহ জীবনের রোমান্সের কথা প্রথম যেদিন শুনি তখন

আমার বয়স মাত্র ছয় বৎসর। কিছুই যে বুঝিনি, এইটুকুই শুধু মনে আছে। হয়তো ভুলেই যেতুম, ভুলিনি—একটি বিশেষ হেতুতে। সেদিন আমি মায়ের কাছে অহেতুক ধমক খাই।

আগ্রা থেকে একজন খাপসুরৎ মেহ্‌মান এসেছিলেন বর্ধমান কিল্‌লায়। না, আগ্রা থেকে নয়, উড়িষ্যা থেকে আগ্রা ফিরে যাবার পথে। উড়িষ্যায় তাঁর ভায়ের অসুখ করেছিল, তাই দেখতে গেছিলেন। দিন দুয়েক ছিলেন বর্ধমানে। খুবই সুন্দরী, তবে আমার মায়ের তুলনায় নয়। একদিন মা তার খাশ্‌কামরায় বসে তস্‌বির বানাচ্ছে। আমি প্রকাণ্ড ঘরের ও-প্রান্তে গুড়িয়া খেল্‌ছি আপনমনে। আগ্রা থেকে যিনি এসেছিলেন তিনি ঠিক মায়ের পিছনেই বসে ছবি আঁকা দেখছিলেন। আম্মাজান তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, 'ছবিটা কেমন হচ্ছে ?'

জবাবে তিনি কী বলেছিলেন, আম্মাই বা কী বলেছিলেন কিছুই বুঝিনি। বড় শক্ত শক্ত সব কথা। শুধু অনেক পরে একটা কথা বুঝতে পারি। ছবি আঁকতে-আঁকতে তন্ময় হয়ে আম্মাজান ভুলে গেছে—এটা বর্ধমান। হঠাৎ আম্মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায় ?'[G]

সেলিম কে, তা আমি জানি না! ঐ কথা শুনেই আমি কিন্তু উঠে পড়েছি। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বলতে গেলুম—'তুমি বদ্ধমানে গো!'

কিন্তু বলা হল না। তার আগেই সেই সুন্দরী কী একটা কথা বললেন। মা জবাবে বললে, 'তুমি এ কথা শুনিলে; কিন্তু আমার শপথ, এ-কথা যেন কর্ণান্তরে না যায়!'

বঙ্কিম খেয়াল করেননি আমার উপস্থিতি। আর কেনই বা করবেন? গোটা ইতিহাসই তো খেয়াল করেনি এ হতভাগীকে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র লিখতে ভুলেছেন যে, পরমুহূর্তেই মেহেরউন্নিসার নজর হল—কাঠের পুতুলটা বুকে জড়িয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি অদূরে। তিনি অহেতুক আমাকে ধমকে উঠলেন—বড়দের কথার মধ্যে তুমি কেন? যাও নিচে যাও, রুস্তমের সঙ্গে খেলগে যাও।

আমি ম্লানমুখে নিচে নেমে এসেছিলুম। আজি-আম্মার ঘরে।

হয়তো ঐ তিরস্কারের জন্যই ঘটনাটা ভুলতে পারিনি। অথবা মনে আছে এজন্য যে, আমার লাঞ্ছনার কথা যখন আজি-আম্মাকে সাতকাহন করে শোনাতে গেলুম তখন সে বলে বসল, সেলিম হচ্ছেন নয়া বাদশাহ্‌। তিনি গদিতে উঠে বসেছেন বলে আমার আম্মাজানের নাকি খুব দুঃখ হয়েছে।

আমার আরও গুলিয়ে গেল। কে কোথায় বাদশাহ্‌ বনেছে তাতে আমার আম্মাজানের দুঃখ হতে যাবে কেন?

ব্যাপারটা আর একটু খোলসা হল আমরা সবাই আগ্রা চলে আসার পরে। তখন আমার বয়স দশ-এগারো। ইতিমধ্যে আব্বাজান মারা গেছেন। অনেক-অনেক কেঁদেছিলাম সেদিন। আমি একটু ঠোঁট ফুলালেই আব্বাজান আমাকে কোলে তুলে নিত, চুমায় চুমায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। তাতেও যদি আমার অভিমান না ভাঙে তখন তার দাড়ি ঘষে দিত আমার নাকে মুখে। সুড়সুড়ি লাগায় আমি খিলখিলিয়ে হাসতে শুরু করতুম। কিন্তু সেই বিশেষ সন্ধ্যায় আব্বাজান আমাকে কোলে তুলে নিল না; আদর করল না। তার লালে-লাল আঙরাখায় যে তার ছোট্ট মুন্নি মাথা খুঁড়ছে, তা চেয়েও দেখল না একবার!

আমরা সপরিবারে চলে এসেছি আগ্রাতে। আজ্জি-আম্মা আর রুস্তম ভাইও এসেছে। আমাদের প্রথমে রাখা হয়েছিল সালিমা বেগমের হেপাজতে। ইনি দ্বিতীয়া মহিষী। মুরাদের জননী। জাহাঙ্গীর এঁকে খুব বিশ্বাস করতেন।

আর একটু বড় হয়েছি। অনেক কিছু বুঝতে শিখেছি এতদিনে। আগ্রা-কিল্লার জৌলুষে বর্ধমানের গেঁয়ো-মেয়েটার মাথা ঘুরে গেছল। নাচ-গান লেগেই আছে, রোজ রাত্রেই আলোর রোশনাই আর আতসবাজির ঝলকানি। বিশেষ করে মনে আছে—যুথিকা-মঞ্জিলের ঝরোকার আড়াল থেকে দেখা হাতির লড়াই। উঃ কী বীভৎস! মাসকয়েক পরে একদিন আজ্জি-আম্মাকে বলি, আচ্ছা, তুমি যে বলেছিলে আগ্রাতে আমার দাদামশাই, দিদিমারা আছে, মামা-মামীরা আছে, এক মামাতো বোন আছে—তাঁরা কোথায়? তাঁদের সঙ্গে তো দেখা হল না?

আজ্জি-আম্মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, তোর বদ-নসীব! কী করবি বল? যদ্দিন না তোর আম্মাজান নিকায় বসছে ততদিন দাদু-দিদার সঙ্গে তোর দেখা হবে না।

আমি অবাক হই। আমার মায়ের নিকায় বসার সঙ্গে দাদু-দিদার কী সম্পর্ক? আর মা যে নিকায় বসতে চলেছে এ খবরটাও তো অজানা। জানতে চাই—ব্যাপারটা কী? কার সঙ্গে মায়ের সাদি হবে?

— শাহ্-য়েন-শাহ্ নূরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর পাদশাহ্ গাজী!

খুব আনন্দ হয়েছিল শুনে। জাহাঙ্গীর লোকটাকে অবশ্য আমার ভাল লাগেনি—কোনদিন আমার সঙ্গে একটা কথা বলেনি, আদর করা তো দূরের কথা। অথচ লোকটা রোজই রাত্রে আসত আমাদের মঞ্জিলে। তা সে যাই হোক, মা যদি বেগম হয় তবে নির্ঘাৎ হবে—'সারাহ্-বেগম', মানে পাটরানী। না হবে কেন? অত বড় হারেমসারায় মায়ের মতো সুন্দরী আর কেউ আছে নাকি? আজ্জি-আম্মা বোধ হয় ভেবেছিল খবরটা শুনে আমি মর্মাহত হব। তা হলুম না দেখে এতদিনে

সে রসিয়ে রসিয়ে আমাকে শুনিয়েছিল—মেহের-সেলিমের মহব্বতের কিস্‌সা।

প্রথম দৃশ্য: নওরোজ বাগিচা।

ফতেপুর সিক্রিতে গিয়েছেন কখনো? সুনহারা মকান—যেখানে বাস করতেন আকবর-জননী হামিদা বানু, হাজী বেগম, বেগা বেগম—তার পশ্চিমে, অর্থাৎ যোধা-বাঈ প্রাসাদের উত্তরে দেখবেন একটা চারচৌকা বাগিচা। সেখানেই বসত নববর্ষে 'নওরোজ'-এর মীনা-বাজার। সওদা বেচ্‌তে আসতেন হারেমভুক্ত সুন্দরীরা আর আমীর-মালিকদের স্ত্রী-কন্যা-পুত্রবধূর দল। ক্রেতা সীমিত। বাদশাহ্‌ স্বয়ং অথবা শাহ্‌জাদার দল। জরির নক্‌শা-তোলা রেশমী চীনাংশুক, সোনার কারুকাজ করা শিরস্ত্রাণ, অস্ত্রশস্ত্র, অথবা মহার্ঘ মস্‌লিন। কী কেনা-বেচা হচ্ছে সেটা গৌণ—আসল কথা হচ্ছে: কে কিনছেন, কার কাছে কিনছেন, আর কী জাতের রঙ্গ-রসিকতা হচ্ছে। এ ঘটনা বাস্তবে 1592 সালের প্রথম ভাগ। শাহ্‌জাদা সুলতান মহম্মদ সেলিমের বয়স তখন তেইশ। আব্জি-আম্মা নিজেই তখন পঁচিশ বছরের সুন্দরী; উদয়পুর মহিষীর সঙ্গে মুঘল হারেমে এসেছে বছর ছয়েক আগে। গিয়াস বেগ্‌-এর স্ত্রী আসফৎ-বেগম একটি দোকান সাজিয়ে বসেছেন। তাঁকে সাহায্য করতে সঙ্গে আছে তাঁর পঞ্চদশী অনূঢ়া কন্যা মেহেরউন্নিসা।

শাহ্‌জাদা সেলিম নাকি কোম্‌ এক সুন্দরীর কাছে দুটি ভাল জাতের কবুতর কিনেছিল। সে দুটিকে বগলদাবা করে ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির আসফৎ-বেগমের পণ্যশালায়। প্রথমটা মেহেরউন্নিসাকে তার নজরে পড়েনি—সে মুখ লুকিয়েছিল পর্দার আড়ালে। শাহ্‌জাদা অন্যমনস্কের মতো মেয়েটিকে বলে, ধরতো এদুটো।

পায়রা-জোড়া হস্তান্তরিত করে একটি দামাস্কাসী ছোরার ধার পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছোরাটি ওর পছন্দ হল। আসফৎ-বেগমের সঙ্গে নানান রঙ্গ-রসিকতা দর-কষাকষি করে পণ্যদ্রব্যটি খরিদ করল। তারপর দাম মিটিয়ে দিয়ে দোকান ছেড়ে রওনা দেয়।

কিছুদূর গিয়ে তার খেয়াল হল! পার্শ্ববর্তী দেহরক্ষীকে জিজ্ঞাসা করে, হ্যা হে, পায়রা-জোড়া কাকে তখন ধরতে দিলুম বল তো?

লোকটা আভূমি-কুর্নিশ করে বললে, মির্জা গিয়াস্ মুহম্মদ বেগ সাহেবের লেড়কিকে খোদাবন্দ্‌। মেয়েটিকে বান্দা চেনে: মেহেরউন্নিসা। চলুন কবুতর-জোড়া ফিরিয়ে আনি।

বলাবাহুল্য আর এক ঝলক মেহেরকে দেখতে পাওয়ার বাসনাটাই ছিল প্রবল।

সেলিম বলে, কোই বাৎ নেই! ধরে নেওয়া যাক, আজকের নওরোজের দিনে কবুতর-জোড়া আমি তাকে উপহার দিয়েছি। চল, অন্য দোকানে যাই—

লোকটা পুনরায় সেলাম করে বললে, শাহ্‌জাদার মুবারকী অপাত্রে বর্ষিত হয়নি গরিবপরবর! তামাম্ ফতেপুর সিক্রির শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ঐ: মেহেরউন্নিসা।

সেলিম চলতে শুরু করেছিল। এ কথায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ক্যা তাজ্জব কি বাতেঁ। সে শাহজাদা অথচ এক সামান্য বে-অকুফের কাছ থেকে তাকে শুনতে হচ্ছে ফতেপুর-সিক্রির সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা কোন্ অসামান্যা!

ইতিপূর্বে দু-দুবার সেলিম দুল্‌হন সেজেছে—ভগবানদাসের আত্মজা মানবাঈ আর উদয়পুরের 'মোটারাজা'র কন্যা মানমতী! কোনটিই পাত্রীর রূপে বিমোহিত হয়ে নয়। মহব্বতে মাতোয়ারা হয়েও নয়, পিতার ইচ্ছায়—রাজনৈতিক বিবাহ। একটি অসামান্যা সুন্দরীর সঙ্গে সে আমলে তার ছিপাই-মহব্বতীয় কারবার চল্‌ছে বটে; কিন্তু আনারকলিকে হারেমজাত করা শক্ত, অন্তত আকবর বাদশাহ্ জীবিত থাকতে। কৌতূহল প্রবল। ফিরে এল সেলিম আসফৎ-বেগমের দোকানে।

এসেই চোখাচোখি হল! সেলিমের চোখে আর পলক পড়ে না। বে-অকুফটা ভুল বলেছে—ও শুধু ফতেপুর সিক্রির নয়, শুধু তামাম হিন্দুস্থানের নয়, এই দুনিয়ার অদ্বিতীয়া সুন্দরী! নূরজাহাঁ—জগতের আলো!

হঠাৎ লক্ষ্য হল, মেয়েটি একটি মাত্র কবুতরকে নিজের বুকের উপত্যকায় চেপে ধরে নতনেত্রে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে; আর মায়ের ভৎর্সনা শুনছে—ছি ছি ছি! শাহ্‌জাদার গচ্ছিৎ সম্পত্তি···

সেলিমকে দেখেই আস্‌ফৎ-বেগম সসঙ্কোচে কী-যেন কৈফিয়ৎ দিতে এগিয়ে এলেন। সেলিমের সেদিকে লক্ষ্য নেই। একদৃষ্টে সে দেখছিল নূরজাহাঁকে। বললে, এ কী! দু-দুটো পায়রা দিলাম, এখন দেখছি একটা! বাকিটা গেল কোথায়?

যেন তানপুরায় কেউ ঝঙ্কার দিল। নতনেত্রে মেয়েটি বললে, উড় গ্যয়ে!

—উড় গ্যয়ে! কৈ সে?—সেলিমের সকৌতুক প্রশ্ন।

মেয়েটি অম্লানবদনে হস্তধৃত কবুতরটিকে নীল আকাশের দিকে উড়িয়ে দিয়ে বিশ্ববিজয়িনীর হাসি হেসে বললে—য়্যাসে!

পরদিন শাহজাদা সেলিম এল হামিদাবানু বেগমের মহলে। অর্থাৎ ঠাকুমার কাছে। আকবরী-মহিষী নন, আকবর-জননীই তখনো হারাম-সারাহ্; অর্থাৎ হারেমের মধ্যমণি। সসঙ্কোচে তার আর্জিটা দাখিল করল। প্রস্তাবটা ক্রমে কানে উঠ্‌ল আকবর বাদ্‌শাহ্‌র—সেলিম নাকি মির্জা গিয়াসের আত্মজাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। সম্রাট বিরক্ত হয়ে বললেন, বে-সরম কি বাতেঁ! সেলিমকে কি কেউ জানায়নি যে, মির্জা গিয়াস্-এর কন্যা বাকদত্তা?

কে একজন সাহস সঞ্চয় করে বলে, সাদি তো হয়নি, বাদশাহ্ হুকুম করলেই···

—কিন্তু এমন বে-কানুনী হুকুমই বা কেন করব আমি! সেলিমকে বল, শাহজাদার উপযুক্ত ব্যবহার করতে! এ কী! পরের বাকদত্তা বধূ তো পরস্ত্রী!

সেলিমের গর্দানার উপর ছিল একটাই মাথা! নিচু হল সেটা।

সম্রাট আকবরের দেহ সেকেন্দ্রা-মকবারাতে শুইয়ে দিয়েই জাহাঙ্গীর কুৎবউদ্দীন কোকাকে পাঠিয়ে দিল বংগাল-মুলুকে। কাজটা ঘোরতর অন্যায়। প্রাক্তন-সম্রাটের স্পষ্ট নিষেধ ছিল; ইতিমধ্যে মেহের সন্তানবতী! হয়তো মানসিংহ বাধা দেবেন। তাই সবার আগে তাঁকে বদলী করা হল বঙ্গদেশ থেকে বিহারে। কুৎব বঙ্গদেশে উপনীত হয়েই সর্বপ্রথম কর্তব্য হিসাবে ডেকে পাঠালো জায়গীরদার-শের আফকনকে। শের আফকন সন্দেহ করেননি এমন একটা ব্যাপার ঘটতে পারে। তাই একাকী এসেছিলেন রাজপ্রতিনিধির সুরক্ষিত শিবিরে। সে সন্ধ্যায় কী ঘটেছিল ইতিহাস জানে না, আমিও জানি না। আমার আন্দাজ— কুৎব কোকা শের আফকনকে দুটি বিকল্প প্রস্তাবের যে কোন একটিকে বেছে নিতে বলেছিল : হয় মেহেরউন্নিসাকে তালাক দিয়ে মান ছেড়ে জান নিয়ে টিকে থাক, অথবা মেহেরকে আঁকড়ে থাকায় মূর্খামিতে মান রাখ, জান দিয়ে।

শের বেণীর সঙ্গে মাথাটাও দিয়েছিলেন। তবে নাকি খাল-হাতে বাঘ মারার তাগৎ—তাই প্রাণ দেওয়ার আগে সিংহের গুহায় ঢুকেও দু-চারজন সিপাহী-সমেত জান নিয়েছিল সিংহের, জাহাঙ্গীরের 'দুধভাই' কুৎব কোকার!

শেষের এই কথাগুলো অবশ্য আজি-আম্মা আমাকে বলেনি। সে শুধু সেদিন আমাকে শুনিয়েছিল নওরোজ মীনাবাজারের ঐ কিস্‌সাটা। এবং আরও কিছু। এটাও ইতিহাসস্বীকৃত। কিন্তু কেমন করে এটা ঘটল? মির্জা গিয়াস এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেলিম মজেছে মেহেরকে দেখে। তাঁরা একথাও জানতেন—তাঁদের আত্মজা অপরের বাকদত্তা। এবং সর্বোপরি সম্রাট স্বয়ং না-মঞ্জুর করেছেন শাহ্‌জাদার আর্জি। তাহলে? সেক্ষেত্রে ঐ নওরোজের ঠিক পরেই সেলিমকে সাড়ম্বরে স্বগৃহে ওঁরা আমন্ত্রণ করলেন কেন?

"মেহেরউন্নিসার তখনো আলিকুলির সঙ্গে বিয়ে হয়নি। গিয়াস সেলিমকে নিজের বাড়িতে একদিন সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন।·· সবাই বসে আছেন, সামনে ফেনোচ্ছ্বসিত রক্তিম পানীয়, রক্তিম আভা সকলের মুখে।···উৎসবের শেষে গিয়াস্ বেগের ইঙ্গিত উৎসবমণ্ডপে একে একে প্রবেশ করলেন বাড়ির মেয়েরা, নিমন্ত্রিত অভ্যাগতারা। মেহেরউন্নিসার স্বচ্ছ গাত্রাবরণে আচ্ছাদিত সুঠাম দেহ, শঙ্খশুভ্র মুখ, কুঞ্চিত কেশদাম; মেহের গান ধরলেন। মেহের নাচলেন। নাচের লীলায়িত ভঙ্গিমায় দোলা লাগলো সেলিমের মনে।"[7]

মানছি—স্বচ্ছ গাত্রাবরণ, নাচ, গান হয়তো কাহিনীকারের কল্পনা। কিন্তু সেলিমের সম্মুখে আলিকুলির বাকদত্তাকে ওভাবে উপস্থাপিত করার মূল প্রেরণাটা কী? তার চেয়েও বড় বিস্ময়—মেহমানদের ভিতর একটি প্রত্যাশিত বিশেষ নাম খুঁজে পাওয়া গেল না কেন? ওঁদের হবু দামাদ—আলিকুলি বেগ্ ইস্তাজ্‌লু?

শুনতে খারাপ লাগবে: কিন্তু একটাই জবাব।

মেহেরউন্নিসার চরিত্রে যেটা সবচেয়ে বড় অভিশাপ—তার সর্বগ্রাসী আকাশ-চুম্বী ক্ষমতালিপ্সা, সেটা সে লাভ করেছিল উত্তরাধিকার-সূত্রে। সুযোগ পেলে গিয়াস্ বেগ তখন নিজেই ঐ দুষ্কর্মটা করে বসতেন, যেটা করতে গিয়ে প্রাণ দিল কুৎবউদ্দীন কোকা—রাতের আঁধারে আলিকুলির পাঁজরে একখানা চোরাগোপ্তা আমূল বিদ্ধ করে দেওয়া। তাহলেই তাঁর কন্যা নিশ্চিতভাবে হয়ে যেত ভবিষ্যৎ ভারত-সম্রাজ্ঞী! মির্জা গিয়াস্ কালে হতেন বাদ্‌শাহ্‌র শ্বশুরশাই!

এসব কথা সেদিন কিন্তু আমার মনে হয়নি। হবে কোত্থেকে? আমার বয়স তখন মাত্র দশ-এগারো। আর তাছাড়া আজি-আম্মার কাছ থেকে আমি তো সবটা সেদিন শুনিনি। আমার আব্বাজানের মৃত্যুর হেতুটা। আগেই বলেছি, আমি খুশি হয়েছিলুম শুনে যে, আমার মা 'সারাহ্‌-বেগম' হতে চলেছে। ভুল বুঝবেন না আমাকে—যে যুগের কথা, তখন 'মেহেজবীন' শব্দটার অর্থ 'বিধবা' নয়, তার অর্থ: 'অপুনর্ধবা'। অর্থাৎ—unremarried!

অধবা থেকে সধবা; এবং তার পরে বিধবা নয়, 'অপুনর্ধবা'।

তাই পরদিনই আমি নাচ্‌তে নাচ্‌তে গেছিলুম মায়ের খাশ্‌-কামরায়। তার গলা জড়িয়ে ধরে বলি, মা গো! তুমি নাকি সারাহ্‌-বেগম হবে?

কোথাও কিছু নেই, মা ঠাশ্‌ করে এক চড় কষিয়ে দিল আমার গালে। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল, লজ্জা করে না বে-সরম! যে তোর বাবাকে খুন করল তাকে নিকা করতে বলিস্! আর যে বলে বলুক—তুই কোন্ পোড়ামুখে এ কথা বলিস্?

বিশ্বাস করুন, আমি কাঁদিনি। এই এগারো বছরের জীবনে সেই প্রথম মায়ের হাতে চড় খেলুম: কিন্তু আমার চোখে জল আসেনি। আমি বজ্রাহত হয়ে গেছিলুম। ধীরে ধীরে সব কুয়াশা সরে গেল।

সব কথা বুঝতে পারি এতদিনে। সব, স—ব কথা। ইচ্ছা করছিল ছুটে চলে যাই বর্ধমানে। সেই ছোট্ট অনাদৃত কবরটাকে আঁকড়ে ধরে বুকফাটা কান্নায় ভাসতে পারি; কিন্তু এখানে, এই বন্দীশালায় আমি কাঁদব না।

মনে পড়ে গেল একটি বিশেষ সন্ধ্যার কথা:

তখন আমার বয়স বছর ছয়েক। আগ্রা কিল্লার সেই সুন্দরী মেহ্মান যেদিন শুনিয়ে গেলেন—আকবর বাদশাহ্‌র এন্তেকাল হয়েছে ; সেলিম বাদশাহ্ বনেছে, তার পরের দিনটাই হবে বোধহয়। আব্বাজান সারা দিনমান কাঁহা-কাঁহা মুলুক ঢুঁড়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরেছে। বসেছে কিল্লার ছাদে একটা চবুতরায়। বসন্তকালের শেষ। মিঠে মিঠে দখিনা বাতাসে আম্র-মুকুলের গন্ধ। পিউকাঁহা ডাকছে পুবদিকের ওই ঝাঁকড়া কদম গাছে। ঝোপে-ঝাড়ে লাখ লাখ জোনাকি। আব্বাজানের সাম-ওয়াক্তের নামাজ খতম হয়েছে ; বসেছে একটা গদিমোড়া কেদারায়। আমি বাপির কোলে। রুস্তম সাহ্‌ন-বাঁধানো মেঝেতে। মা একটু দূরে মাদুর পেতে বসেছে ; তানপুরায় প্রিং-প্রিং করছে। সান্ধ্য প্রসাধন শেষ হয়েছে তার। পিঠের উপর খোলা চুল, খোঁপা বাঁধেনি। পরেছে একটা আশমানি-রঙের ঢাকাই মস্‌লিন। ভারি মিঠে একটা গন্ধ ভেসে আসছে সেদিক থেকে।

বাপি আমাদের গল্প বলছিল। তার ঝুলিতে অনেক-অনেক কিস্‌সা। আবব্য-রজনীর গল্প, বাবুর বাদশাহ্‌র দিগ্বিজয়, মায় হিঁদুদের কিস্‌সাও। কিন্তু আমি আর রুস্তম বারে বারে শুনতে চাইতুম একটা বহুবার-শোনা গল্প। মেবারের জঙ্গলে একটা চিতাবাঘ শিকারের কাহিনী। বিল্‌কুল খালি হাতে! বাপি অঙ্গভঙ্গি করে রীতিমতো অভিনয় করে দেখাতো—কীভাবে গুড়িমারা বাঘটা হালুম করে বাপির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বহুবার দেখা নাটক তবু প্রতিবারই বাপির কণ্ঠে ঐ 'হালুম' শুনলেই আঁতকে উঠ্‌তুম আমি। বাপিও আমোদ পেত—ঐ 'হালুম' অংশটা দু-তিনবার শোনাতো। তারপর দেখিয়ে দিত বাঘনখপরা আঙুল দিয়ে সে কেমন করে খুবলে নিয়েছিল বাঘের চোখজোড়া। আর তারপর মল্লযুদ্ধ। অন্ধ ব্যাঘ্রশাবক আর নিরস্ত্র শের আফকন। কাহিনীর শেষাশেষি বাপিকে গায়ের কুর্তাটা খুলতে হত। ওঁর বাঁ-কাঁধের সেই ক্ষতচিহ্নটায় তাঁর মুন্নি চুম্‌-না-খাওয়া পর্যন্ত গল্পটা শেষ হত না। কিন্তু সেদিন—সেই অবাক-সন্ধ্যায় ব্যাঘ্রহত্যাতেই আসর ভাঙল না। বাপির বাঁ-কাঁধে চুমু দিয়ে আমি বেমক্কা একটা প্রশ্ন পেশ করে বসি, তুমি দুনিয়ার কোন বাঘকেই ডরাও না, না বাপি?

আব্বাজান দাড়িটা চুলকালো কিছুক্ষণ। যেন ভাবছে। একবার আড়চোখে দেখেও নিল সঙ্গীতমগ্নার দিকে। তারপর বললে, একটা বাঘ ছাড়া!

আমি তো তাজ্জব। বাপি ডরাবে এমন বাঘ দুনিয়ায় পয়দা হয়েছে নাকি? চোখ পিট্ পিট্ করে জানতে চাই, কোন জঙ্গলে থাকে সেই হতভাগা বাঘটা?

—আগ্রার জঙ্গলে। জানিস্ মুন্নি, চিতোরে ঐ বাঘটাকে খতম করে আমি যখন আগ্রায় ফিরে এলুম তখন তো আমি বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে পারি না। নড়তে

পারি না, চড়তে পারি না, সারা গায়ে ক্ষত। আর তখন সেই আগ্রা-জঙ্গলের লোভী বাঘটা সুযোগ বুঝে রোজ আসত আমাদের বাড়িতে। সাঁঝের ঝোঁকে ঘুর-ঘুর করত, ছোঁক-ছোঁক করত···

—ভিতরে ঢুকতে পারত না?

—পারত! তোর আম্মাজান দোর খুলে দিত যে। সেটা তো বনের বাঘ নয়, মনের বাঘ।

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে আম্মা থামিয়ে দিয়েছিল বাপিকে। যন্ত্রটা তুলে নিয়ে দুম্ দুম্ করে ছাদ থেকে নেমে গেছিল। আর বাপির ছাদ-ফাটানো অট্টহাসি!

চার বছর পরে এতদিনে সেই অট্টহাসির অর্থ বুঝতে পারি। আগ্রা-জঙ্গলের সেই ছোঁক-ছোঁক বাঘটার চেহারা যে স্পষ্ট দেখতে পেলুম আমি।

'—যে তোর বাপকে খুন করল···'

সারারাত কেঁদেছিলুম আমি।

শের আফকনের মৃত্যু, তা সে যেভাবেই হোক, আর মেহেরউন্নিসার দ্বিতীয়বার বিবাহের মধ্যে সময়ের ফারাক সাড়ে-চার বছর। এ কয় বছরে আমার মায়ের যে মানসিক পরিবর্তন তা অবিশ্বাস্য! তার চরিত্রে অনেকগুলি—'দোষগুণ' যাই বলুন—প্রচণ্ড প্রেরণা ছিল। সর্বগ্রাসী ক্ষমতালিপ্সাই তার মধ্যে প্রধান। এ ছাড়া ছিল সঙ্কল্পে অটুট থাকার দৃঢ়তা, কূটবুদ্ধি, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা আর 'বশীকরণ-মন্ত্র'টা! কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে খারাপ লাগত তার 'আত্ম-কেন্দ্রিকতা'! দুনিয়ায় সে চিনত শুধু নিজেকে। স্বার্থ! ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সে সবকিছু করতে পারত।

আমায় যেদিন চড় মারে সেদিন তার প্রতিশোধ-পরায়ণতাই প্রবল ছিল।

মেহেরউন্নিসা এই দুনিয়ায় শুধু একজনকে ভালবেসেছিল।

যারা বলে, মেহের ভালবেসেছিল শের আফকনকে—সারাটা জীবন তার জন্য মনে মনে গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদেছে, তারা ভুল বলে! যারা বলে, নূরজাহাঁ ভালবেসে ছিল জাহাঙ্গীরকে, তারাও ভুল বলে। শের আফকনকে ভালবাসলে—'ভালোবাসা' বল্‌তে আমরা যা বুঝি, যে অর্থে নিয়েছেন বঙ্কিম ("দাসীর স্বামী জীবিত থাকিতে সে কখনও দিল্লীশ্বরকে মুখ দেখাইবে না; আর যদি দিল্লীশ্বর কর্তৃক তাহার স্বামীর প্রাণান্ত হয়, তবে স্বামীহন্তার সহিত ইহজন্মে তাহার মিলন হইবেক না।"৪) তাতে জাহাঙ্গীর-নূরজাহাঁর প্রেম—আকাশকুসুম।

মেহের শুধু ভালবেসেছে একজনকে—নূরজাহাঁকে।

জাহাঙ্গীরকে সে সেবা করেছে, শুশ্রূষা করেছে, পরিতৃপ্তি দিয়েছে, পরিচালিত করেছে। জানি, জানি তা — বিবাহ করেছে, শান্ত করেছে, রাতের পর রাত তার সঙ্গে একই শয্যায় শয়ন করেছে—সবই মানছি। কিন্তু ভালবাসতে পেরেছিল কি ?

জীববিজ্ঞানের দিক থেকে একটা তত্ত্ব কি লক্ষ্য করেছেন আপনারা ? বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে অশোভন ; কিন্তু তথ্যটা দাখিল করি : নূরজাহাঁ এবং জাহাঙ্গীরের বিবাহিত জীবনের দৈর্ঘ্য আঠারো বছর। নূরজাহাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়স থেকে তার একান্ন বছর বয়স পর্যন্ত। জাহাঙ্গীরের প্রতিটি বেগম তাঁকে সন্তান উপহার দিয়েছে, এটা তথ্য ; মেহেরউন্নিসা যেমন উপহার দিয়েছিল আলি-কুলিকে একটি কন্যাসন্তান। আর মুঘলযুগের ঐ ইতিহাসটা যাঁরা একটু নাড়াচাড়া করেছেন তাঁরাই জানেন — ঐ আঠারো বছর ধরে নূরজাহাঁ একটি পুত্রপ্রতিম অবলম্বন খুঁজে ফিরেছে পাগলের মতো। যাতে জাহাঙ্গীরের জমানা খতম হলেও নূরজাহাঁর কর্তৃত্ব বজায় থাকে, নতুন করতলগত বাদশাহের মারফৎ। এজন্য সে কার কাছে হাত পাতেনি ? জাহাঙ্গীরের একটি উত্তরাধিকারীর সন্ধানে সে কী না করেছে ? খসরৌকে জামাই করতে চেয়েছে, খুররম্‌কে বাঁধতে চেয়েছে ভাইঝিকে দিয়ে, পারভেজ, জাহান্দার শাহ্‌রিয়ার — একটা বাদশাহ্‌জাদা হলেই হল ! এটাই ইতিহাস !

এই পটভূমিকায় চিন্তা করে দেখুন লাডলী-বেগমের কোন বৈপিতৃক ভাই বা বোন নেই !

কেন ?

ঐ সঙ্গে স্মরণ করুন—মুঘল-হারেমে 'লাল-ত্রিকোণ' বলে কিছু জানা ছিল না। থাকলে, মমতাজ-বেগম উনিশ বছর দুই মাস এগারো দিনের বিবাহিত জীবনে চৌদ্দটি সন্তান প্রসবান্তে রক্তাল্পতায় মৃত্যুবরণ করে ভারতবর্ষকে 'তাজমহল' উপহার দিয়ে যেত না।

সাড়ে-চার বছরে তিল তিল করে বদলে গেছিল মেহেরউন্নিসা। তার 'আমিত্বের' প্রভাবে, তার সর্বগ্রাসী ক্ষমতালিপ্সার প্রভাবে। গুলবদন বেগম অথবা হামিদাবানু বেগম যা পারেনি হুমায়ুনী আমলে, মরিয়াম জমানী যা পারেনি আকবরী-জমানায়, সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে। সুলতানা রিজিয়ার মতো মূর্খামি সে করবে না—উঠে বসবেনা কোনদিন তক্ত-সুলেমানে। সে বসে থাকবে ঝরোকার আড়ালে — মদ্যপ, অহিফেন-আসক্ত একটা স্ত্রৈণ শিখণ্ডীকে বসাবে মসনদের উপর। লোকটা আদৌ নিরক্ষর নয় আকবর-বাদশাহ্‌র মতো। আকবর সারাজীবন দুঃখ করেছেন নিজের অক্ষর-পরিচয়হীনতার জন্য। তাই মাত্র চার বছর বয়স থেকেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। গৃহশিক্ষক ছিলেন মহাপণ্ডিত আবদুর রহিম খান-

ই-খানান। তিনি সেলিমকে শিখিয়েছেন—আরবী, ফারসী, হিন্দী, উর্দু, সংস্কৃত ভাষা ; আর সেইসঙ্গে ইতিহাস, ভূগোল, প্রাণিবিদ্যা। মিনিয়েচার-পেইন্টিং বিষয়ে জাহাঙ্গীর তো তাঁর আমলে ছিলেন একজন 'কনোশার'! কিন্তু হলে কি হবে? নূরজাহাঁ তাকে মুঠোয় বন্দী করল। দু দশক ধরে নূরজাহাঁ ছিল বেনামদারী বাদশাহ্। সেভাবেই চেয়েছিল চালিয়ে যেতে জীবনের বাকি কটা বছর, জাহাঙ্গীর জমানার পরেও—খস্‌রৌ, খুররম্ অথবা শাহ্‌রিয়ারকে কব্জা করে। পারেনি।

কিন্তু মায়ের কথা কেন সাতকাহন করে শোনাচ্ছি বোকার মত? আমার কথা বলি, শুনুন। আরও একটা তথ্য কি নজরে পড়েছে আপনাদের? যে আমলের কথা, তখন বারো-তের বছর বয়সে অনূঢ়া কন্যার বাক্‌দান হত, পনের-ষোলোয় হত সাদি। আমার কী হল? মুঘল-হারেমে যেদিন বন্দী হয়ে আসি, সেদিন আমি অষ্টম বর্ষীয়া ; আর নূরজাহাঁর ব্যবস্থাপনায় যেদিন তার ভাইঝির সঙ্গে খুররমের সাদি হল, সেদিন আমি ত্রয়োদশী। নূরজাহাঁ কেন বেছে নিল ভাইঝিকে? আর্জুবানু বেগম, মানে ভবিষ্যৎ মমতাজ-মহলকে? কেন নয় নিজের বাপহারা আবাগীটাকে?

লিখতে সরম হয় তবু যা জেনেছি, বুঝেছি, তা অকপটে দাখিল করি : নূরজাহাঁ জানত, আমি জাহাঙ্গীরের দৃষ্টিতে হারেমের এক উট্‌কো আপদ। না যায় তাড়ানো, না জিইয়ে রাখা! নূরজাহাঁ বুঝেছিল, বাদশাহ্‌র এই চক্ষুশূলকে সাদি করলে সেই অপরাধেই খুররম্ সম্রাটের বিরাগভাজন হয়ে পড়বে। ঐ খুররম্‌কে কব্জা করেই নূরজাহাঁ যে সে আমলে তার ভবিষ্যৎটা নিরাপদ করতে চাইছে—খুররম্‌কে সিংহাসনে বসিয়ে অন্তরাল থেকে হিন্দুস্থান শাসন করা!

এজন্যই আমাকে মায়ের সঙ্গে রাখা হয়নি। ঐ সাড়ে-চার বছর আমি মেহেরউন্নিসার সঙ্গে এক-মহলে বাস করিনি। আমি ছিলুম অন্য একটা সংলগ্ন মহলে, আজ্জি-আম্মার হেপাজতে। আমার সঙ্গে একই কামরায় বাস করত আর একটি হারেম-বাঁদী—আমার চেয়ে বছর সাত-আটের বড়, মীনাবিবি। বহুভোগ্যা ছিল সে। কাশ্মীরী। খুবই সুন্দরী। যেমন রঙ, তেমনি দেহের গঠন। এক-এক রাত্রে এক-এক শাহ্‌জাদার ঘরে 'ডিউটি' পড়ত তার। যেমন-যেমন নির্দেশ আসত। নির্দেশ পাঠাত সারাহ্-বাঁদী, হারেমের মুখ্য অধিকারিকা। কে কবে কার ঘরে রাত কাটাবে, অর্থাৎ বহুপত্নিক শাহ্‌জাদাবর্গের মধ্যে কার কবে একটু মুখ বদলাবার সখ হবে তার হক্‌-হদিস্ সারাহ্-বাঁদীর নখদর্পণে।

মীনা-বিবি ছিল আমার বড় বোনের মত। সে-ই আমাকে হুঁসিয়ার করে

দিয়েছিল, খুব সাবধান, শাহ্-য়েন-শাহ্‌র নজর যেন তোর উপর কোনদিন না পড়ে।

—কেন রে? জানতে চাই আমি!

—বুড়বকের বেহদ্দ তুই! বুঝিস্ না কেন? তোকে দেখলেই ওঁর মনে পড়ে যায় একটা পুরোনো দিনের পাপকাজের কথা। আর তা ছাড়া নূরজাহাঁ বেগম-সাহেবার যে একটা অতীত দাম্পত্যজীবন আছে, সে যে এককালে আর কারও বিছানায় রাত কাটাতো একথা যে উনি ভুলে থাকতেই চান! বুঝলি না?

তা বটে!

আপনারা হয়তো জানেন না আমার দাম্পত্য জীবনের কথা। এ তো কোন উপন্যাস নয়, আমার আত্মকথা—তাই কইমাছের মতো আপনাদের 'কৌতূহল'টা জিইয়ে রাখার কোন দায় আমার নেই। মোদ্দা কথাটুকু প্রথমেই বলে রাখি—আমার সাদি হয়েছিল বাইশ বছর বয়সে, অর্থাৎ আমার মায়ের নিকা সুসম্পন্ন হবার পাক্কা দশ বছর পরে! আমার বিবাহিত জীবনের ব্যাপ্তি সাত বছর, আর আমিও একটি মাত্র কন্যার জননী। এই দশ বছরে নূরজাহাঁ কি তার অরক্ষণীয়া কন্যার বিয়ের কথা ভাবেনি? ভেবেছে! কন্যা অরক্ষণীয়া বলে নয়—তার উপেক্ষিত যৌবন শুকিয়ে যাচ্ছিল বলে নয়, সম্পূর্ণ অন্য কারণে। জাহাঙ্গীর-জমানার অবসানে তার ক্ষমতা অম্লান রাখতে। প্রথম প্রস্তাব তুলেছিল জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ-পুত্র শাহ্‌জাদা খস্‌রৌর সঙ্গে। তখনো সে জানত না—লাড্‌লী বেগম সম্রাটের এতবড় চক্ষুশূল এবং ক্ষীণ আশা ছিল খস্‌রৌ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। কারণ জাহাঙ্গীর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ওর চোখের চিকিৎসা করাচ্ছিল। সম্রাটের ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র—উদার, মহৎ, মঘল-দৈত্যকুলে সে এক প্রহ্লাদ! যেমন ছিল পরের জমানায় শাহজাহাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশুকো। হিন্দুস্থানের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, জাহাঙ্গীর আর শাহজাহাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রদ্বয় ভারতবর্ষের সিংহাসনে বসেনি। বসলে, মুঘল-সূর্য অত শীঘ্র অস্তমিত হত না। কারণ ওঁরা দুজনেই ছিলেন মহামহিম জালালুদ্দিন আকবরের প্রকৃত উত্তরসূরী। ওঁরা দুজনেই অন্তর দিয়ে বুঝেছিলেন—ভারতবর্ষ একা হিন্দুর নয়, একা মুসলমানেরও নয়। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তিই এর প্রাণরস।

খসরৌর সঙ্গে কিন্তু আমার সাদি হল না। হেতুটা শুনলে আপনারা হাসবেন। হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইছেন না। কিন্তু এ আমার গল্পকথা নয়, ঐতিহাসিক তথ্য! সেই আজব হেতুটা এই: খস্‌রৌ 'একপত্নিত্বে বিশ্বাসী'! নারীর যদি একসঙ্গে একাধিক স্বামী থাকা বে-সরমী, তবে নরেরও একাধিক পত্নী বে-আদপী! নরনারীর প্রেম একমুখী না হলে তা স্বর্গীয় হয় না। এই তার বিশ্বাস! উনি

যেহেতু ইতিপূর্বেই উজির খাঁ আজিমের কন্যার পাণিপীড়ন করেছেন তাই তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে অশক্ত! এমন দৈতকুলের প্রহ্লাদ যে মুঘল জমানায় তক্ত-সুলেমানে আসীন হতে পারবে না এ তো জানা কথাই!

আমার যখন বাইশ বছর বয়সে সাদি হল তার আগে আমার মামাতো বোন, দেড় বছরের বড়, আর্জুবানু বেগম, আট আটবার গর্ভিণী হয়েছে—জাহানারা, দারা থেকে ঔরঙ্গজেব, মুরাদ সবাই জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু আমার সাদির কথা পরে।

পরিবর্তন কি একা মেহেরউন্নিসারই হয়েছিল? তার মেয়ে লাড্‌লী বেগমেব হয়নি? এমন আজব কথাটা বলব না। জাহাঙ্গীর-হারেমের একান্তে, নূর-মহলের অদূরে অন্তেবাসী যে বন্দিনী আট-বছরের বালিকা বয়স থেকে অষ্টাদশী হয়ে উঠল, তার দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনটাও অনিবার্য। 'পহিলে বদরী সম, পুন নবরঙ্গ, দিনে দিনে অনঙ্গ আগোঢ়াল অঙ্গ'। দর্পণে নিজ প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যেতুম। আমার চতুর্দিকে কামনা-বাসনার হোরি-খেলা হচ্ছে। শুধু আমিই পড়ে আছি একান্তে। রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আমি যেন এক অচ্ছুৎ-দর্শক। হারেমে শাহ্‌জাদারা আছে, আরও পাঁচজন গণ্যমান্য পুরুষের যাতায়াত আছে—কারও প্রকাশ্যে, কারও গোপনে। মদন-মন্দিরে কে কখন কার নায়িকা, কে-কখন কার নায়ক, তা বোধকরি রতি-মদনেরও হিসাবের বাহিরে। এমন কি নিষিদ্ধ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। শুধু এক দুর্লভ ব্যতিক্রম এই লাড্‌লী-বেগম। নূরজাহাঁকে ডরায় না এমন মানুষ তখন হিন্দুস্থানে নেই। তাই তার মেয়ের দিকে সাহস করে কেউ হাতই বাড়ায় না। আমি নিজেই ছিলুম একটু লাজুক প্রকৃতির। নিজে থেকে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিত।

আমি দেখতে কেমন ছিলুম? মাফি কিয়া যায়! ওটা আপনারা বরং কল্পনা করে নিন। আপনারা তো জানেনই যে, আমার আব্বাজানকে দেখে ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখেছিল—Indian Apollo; আর আমার মা? শুধু বলব, তাঁর নাম: নূরজাহাঁ!

এটুকুই এ অভাগীর রূপের পরিচয় হিসাবে যথেষ্ট নয় কি?

আপনারা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না—কিন্তু আল্লাহ্‌র নামে শপথ নিয়ে বল্‌ছি—সেই অনাদৃতা মুঘল হারেমের বন্দিনী, নূরজাহাঁ-দুহিতা তার আঠারো বছর বয়সেও জানত না—পুরুষমানুষে ঠোঁটে চুমু খেলে সারা দেহে কী-জাতের শিহরণ হয়! জানত না মানে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। পরোক্ষজ্ঞান তার টন্‌টনে! কৌতূহল যে প্রচণ্ড! আর সেটা যে স্বাভাবিক একথা নিশ্চয় মানবেন? আমার

জ্ঞানের ভাণ্ডার নিত্যি বেড়ে যেত মীনা-বহিনের কল্যাণে। আব্বি-আম্মার নজর এড়িয়ে সে আমাকে শোনাতো তার মুখরোচক অভিসার-কাহিনী। তার প্রতি-রাত্রির নিরাবরণ দৈহিক-অভিজ্ঞতা! আমার নিশ্বাস ঘন হয়ে আসত, শরীরের উত্তাপ যেত বেড়ে। আমি শুধু বলতুম—তারপর? তারপর?

মীনা-বহিনের মতো অনেক-অনেক সুন্দরী ছিল হারেমে। হিন্দুস্থানের কাঁহা-কাঁহা মুলুক থেকে তাদের এনে গুদামজাত করা হয়েছে। সারাহ্-বাঁদীর ভাষায় এরা হচ্ছে: 'বে-ওয়ারিশ্ হুরী'। অর্থাৎ তার গুদামঘরের 'ফ্রি-লান্সার'। এছাড়া প্রতিটি শাহ্‌জাদার নিজস্ব হারেমে, নিজস্ব সারাহ্-বাঁদীর তত্ত্বাবধানে সঞ্চিত আছে অসংখ্য যৌবনবতী উপপত্নী। তারা অপরের মহলে রাত কাটাতে যেতে পারে না। পালা করে যেতে হয় একই শাহ্‌জাদার শয়নকক্ষে। মীনা-বহিনরা সে-জাতের নয়। এরা বহিরাগত মেহ্‌মানদেরও খিদমৎ করে। গান জানে সবাই, নাচতেও। আর জানে রতিকলা। শাহ্‌জাদাদের উপপত্নীর সংখ্যা সীমিত—মাত্র কয়েক শত। তাই মাঝে মাঝে এদের তলব পড়ে, যখন চেনামুখ দেখে-দেখে শাহ্‌জাদারা বে-দিল হয়ে পড়ে।

মীনা-বহিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। প্রায় সব কয়জন শাহ্‌জাদার ঘরেই রাত কাটিয়েছে, এমন কি জাহাঙ্গীর যখন শাহ্‌জাদা সেলিম তখন তাঁর ঘরেও। সে অভিজ্ঞতাও সাড়ম্বরে শুনিয়েছিল আমাকে। তখন ওর বয়স মাত্র তের! ভীষণ যন্ত্রণা হয়েছিল ওর। উপায় নেই! সহ্য করতে হয়েছিল। সেই ওর প্রথম পুরুষ-সহবাস! ও বলত—গোটা আগ্রা-কিল্লায় একটিমাত্র লোকের ঘরে সে রাত কাটায়নি, খস্‌রৌ! একপতিত্বের বুঢ়বকিতে যে অন্ধের বেহদ্দ! অনেকদিন পরে একদিন মীনাবিবি বলেছিল, সবচেয়ে ভয় হয় যখন শাহ্‌জাদা খুররমের ঘরে ডাক পড়ে।

আমার কৌতূহল ততক্ষণে তুঙ্গে। নিঃসন্দেহে শাহ্‌জাদা খুররম্ আগ্রা-কিল্লায় সবচেয়ে সুদর্শন! বহুবার তাকে দূর থেকে দেখেছি। তখনো সে আমার ভগ্নিপতি হয়নি। মানে আর্জুবান্নুকে সাদি করেনি। তার মানে এ নয় যে, খুররম্ অবিবাহিত। কান্দাহার রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেছে সে ইতিমধ্যে।

আমি জানতে চাই, খুররম্‌কে এত ভয় কেন?

—ও যে দারুণ উর্বর! তার ঘরে একরাত কাটিয়ে এলেই—ব্যস্! তলপেট তরমুজ!—বলেই খিল্‌খিল্ হাসি!

সে-হাসিতে আমার রক্তে আগুন ধরে যেত। কান-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করত।

মীনা বলত, পরভেজ বা জাহান্দারকেও সামলানো শক্ত। কিন্তু আমি তো

কায়দাটা জানি—সন্ধ্যে থেকেই মদ গেলাই। দু-চার পাত্র টেনেই ওরা মাতাল হয়ে পড়ে।

—মাতাল হলে তো আরও ভয়ের কথা।

—দুর পাগ্‌লি! মাতাল হলে আর ভয় নেই। এক আধটু চট্‌কা-চট্‌কি করতে করতেই ঘুমে ঢলে পড়ে।

—আর খুররম্‌? সে মদ খেয়ে মাতাল হয় না?

—অন্য সময় খায় কিনা জানি না; কিন্তু ভা—রী হুঁসিয়ার সে। ওসময় এক ফোঁটা মদ সে খাবে না। তার সঙ্গিনী যদি খেতে চায় তাতে আপত্তি নেই। তার সেজন্যেই শয্যাসঙ্গিনীকে ঠিক মতো তৈরী করে নিতে জানে। আমার তো মনে হয়, ঐ জন্যেই যে ওর ঘরে শুতে যায় তারই পেট···

আমি বাধা দিয়ে বলি, 'ঠিক মতো তৈরী করে নেওয়া' মানে?

খিল্‌খিল করে হেসে ওঠে মীনা। বলে, ন্যাকা। কিছুই বুঝিস্‌ না, নয়? তা তুই একদিন যা না খুররমের মহলে। যাবি? একপেট তরমুজ খেয়ে আয়।

গুড়গুড করে উঠ্‌ত বুকের মধ্যে। মুখে বলতুম, দূর মুখপুড়ি!

—সবচেয়ে মজা হয়, যেদিন শাহ্‌জাদা শাহ্‌রিয়ারের ঘরে ডাক পড়ে। জানিস্‌ তো, বেচারির বউ নেই। নেহাৎ বাচ্চা ছেলে। শাহ্‌জাদা, কিন্তু বউ জোটেনি। ওর নিজস্ব হারেমও নেই। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যেতে বাধ্য হয়। সারাহ্‌-বাঁদী রাগারাগি করে, কিন্তু কেউই যেতে রাজী নয়—

—কেন? কেন?

—তুই দেখিস্‌নি ওকে?

—না! কেন?

—লোকটা জড়ভরত। ওর নাম 'ন-সুদ্‌নী'। অকর্মার ধাড়ি। বাঁ-হাতটা পক্ষাঘাত-গ্রস্ত। কথা জড়িয়ে যায়! মুখ দিয়ে ক্রমাগত লালা ঝরে। বোঝে সব—খিদেও আছে—কিন্তু পারে না।

—'পারে না' মানে? কী পারে না?

—কিছুই পারে না। আমি তো ওর ঘরে পাঁচ-সাত রাত কাটিয়েছি। কাজের মধ্যে কাজ—ক্রমাগত তার লালা মুছিয়ে দেওয়া। চোখ দুটো যেন তার ঠিকরে বেরিয়ে আসে। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। মুখের দিকে, আর বুকের দিকে। একবার ওর কী মতিচ্ছন্ন হল—তেড়ে এল আমার দিকে। বহু কসরৎ করেও আমার কাঁচুলির ফাঁসটাই খুলতে পারল না। শেষে গলদঘর্ম হয়ে কাঁদতে শুরু করল।

—তুই নিজেই কাঁচুলির ফাঁস খুলে দিলি না কেন ?

—দায় পড়েছে আমার। 'ন-স্বদনী' আছিস্, তাই থাক না বাপু। পিঠের উপর অতবড় কুঁজ, চিৎ হয়ে শোবার সখ কেন ?

আমার মায়া হত। ভয়ও হত। হারেম-সারার ঘুলঘুলিয়ায় যদি কোনদিন ওর সামনা-সামনি পড়ে যাই ? নারীসঙ্গবঞ্চিত কিশোরটা যদি এক হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে ! বেশি কিছু অবশ্য সে করতে পারবে না—মীনাবহিন বলেছে, সে ক্ষমতাই তার নেই। কিন্তু যদি তার লালাসিক্ত মুখে…

গা-টা ঘিন ঘিন করতে উঠত !

কিন্তু ঐ ঘুলঘুলিয়ায় লুকোচুরি খেলতে খেলতে হঠাৎ যদি বাঁকের মুখে শাহ্‌জাদা খুররমের সামনে পড়ি। খুররম্ দুঃসাহসী। নূরজাহাঁর প্রিয় পাত্রও। সে বোধহয় ছেড়ে কথা বলবে না। তবে ঐ নরম দাড়ির-ঢাকা মুখে…

ছি-ছি-ছি ! কী সব বিশ্রি চিন্তা !

মেহেরউন্নিসা যেদিন নূরজাহাঁ হল—জাহাঙ্গীরের মহিষী হল—তার ঠিক এক বছর পরে খুররম্ সাদি করল আমার মামাতো দিদিকে। আর্জুবানু বেগমকে। আমার বয়স তখন চোদ্দ ছুঁই-ছুঁই ; দিদি আমার চেয়ে দেড় বছরের বড়। কিন্তু দেখলে আমাকেই বড় মনে হত। কারণ আর্জুবানু ছিল রোগা, একহারা, যেন কৈশোরের মায়া ত্যাগ করতে পারছে না। আর আমার অবস্থা ঠিক উল্টো ! তের-চৌদ্দ বছরেই আমাকে মনে হত—ষোলো-সতের। ডক্টর বেণীপ্রসাদ বলেছেন, খুররমের এই সাদির সম্বন্ধ এনেছিল মেহেরউন্নিসা—ভাইঝির সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তাকে কব্জা করতে। কথাটা ভুল। না ; ভুল নয়, অর্ধসত্য। মেহেরই সম্বন্ধ আনে, বাদশাহ্‌কে রাজী করায়, তার উদ্দেশ্যটাও ঠিকই ধরেছেন ডক্টর বেণীপ্রসাদ ; কিন্তু তিনি খবর পাননি—তার আগেই ওরা দুটিতে পরস্পরের প্রেমে পড়েছিল। সেটা দুজনেই গোপন রেখেছিল। ভাবখানা দেখালো—যেন বাপ-মায়ের ইচ্ছানুসারে বিয়ে করল ওরা। আসলে তা ঠিক নয়। এটা আমার শোনা কথা নয়—প্রত্যক্ষ জ্ঞানে। সে-কথাই বলি—

শাহ্‌জাদাদের কাছে এমনিতেই পর্দা কিছুটা শিথিল ; তার উপর খুররম্ এখন আমার ভগ্নিপতি। তার চেয়েও বড় কথা, আর্জুবানু হারেমের ভিতরেই পেয়েছিল একজন বাপের বাড়ির লোক। বান্ধবী শুধু নয়, আত্মীয়া। প্রায়ই সে আমাকে ডেকে পাঠাতো শাহ্‌জাদার মহলে—আড্ডা দিতে। তার মহলে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই গান-বাজনা ও নাচের আসর বসত। শাহ্‌জাদা খুররম্—মধ্যমণি। সে

কিন্তু মদ্যপান করত না। আশ্চর্য! গান অধিকাংশই ঠুংরি। কত্থক নাচের প্রচলন বাড়ছে।

কি জানি কেন, প্রথম দিন থেকেই জামাইবাবু আমাকে একটু নেক-নজরে দেখত। হাসি-ঠাট্টা মশ্‌করা লেগেই থাকত। এমনকি অনেকে এ-নিয়ে আমাকে ঈর্ষা করতেও শুরু করল।

ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠল প্রায় বছর খানেক পরে। আর্জুর গর্ভে তখন প্রথমা কন্যা, জাহানারা। ও বেশি নড়াচড়া করত না। এমনিতেই দুর্বল শরীর। শুয়ে শুয়ে গান শুনতো বা নাচ দেখত। শাহ্‌জাদা এক-এক সময় এক-এক সুন্দরীকে নিয়ে যমুনার দিকে ঝোলা বারান্দায় উঠে যেত। নিম্নকণ্ঠে রঙ্গ রসিকতা করত। আবার ফিরে আসত গানের আসরে। তেমনি একদিন ও হঠাৎ আমাকে একান্তে পেয়ে যায়। 'একান্তে' মানে, আশেপাশে আরও লোক আছে। আমাদের দেখতেও পাচ্ছে, হয়তো কথোপকথন শুনতে পাচ্ছে না। শাহ্‌জাদা হঠাৎ আমার হাতটা টেনে নিয়ে বল্‌লে, তোমার মা কিন্তু আমার প্রতি অবিচার করেছে! আমাকে ঠকিয়েছে!

আমি চম্‌কে উঠি। বলি, কেন?

—আঁচলের আড়ালে সাচ্চা মোতি লুকিয়ে রেখে ঝুটো-মুক্তোর মালা আমার গলায় পরিয়ে দিল।

আমি স্তম্ভিত! এ কী বলছে খুবরম্‌। শশব্যস্তে বলি, এসব কী বলছেন?

—এখন আফ্‌সোস করা বৃথা,—এ-কথাই তো বলতে চাইছ?

—আমি কিছুই বলতে চাইছি না। বহিনজী শুনলে কী বলবে?

—কিছুই বল্‌বে না। তার সঙ্গে আমার মহব্বতের পরেও আমি কাহান্দার কুমারীকে সাদি করেছি। কই তাতে তো তার দিল্‌ টোটেনি!

অবাক হয়ে বলি, বহিনজীর সঙ্গে আপনার মহব্বত হয়েছিল? সাদির আগে?

—হরগীজ মহব্বত। কাল বিকালে এস, তার সামনেই তোমাকে সে গল্প শোনাব। কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?

—কী প্রশ্ন?

—তুমিও কি ঐ বুদ্ধবক খস্‌রৌর মত বিশ্বাস কর যে, পুরুষমানুষ একটার বেশি সাদি করতে পারবে না?

আমার হাত পা অবশ হয়ে আসে। প্রশ্নোত্তর কোন্‌ খাতে চলেছে সেটুকু অনুমান করতে পারব না, এতবড় মূর্খ আমি নই। খস্‌রৌ ছাড়া মুঘল রাজ-

পরিবারে প্রত্যেকটি পুরুষই একাধিকবার সাদি করেছে। খুররম্ তো ইতিমধ্যেই তিনবার সাদি করে বসে আছে। শরিয়তি কানুনে চারবার বিবাহ অনুমোদিত! কিন্তু সে কি আমার রূপ-যৌবনে এতই মুগ্ধ যে, মাত্র এক বছরের ভিতরেই আর্জুবানুকে বাতিল করার কথা ভাবছে?

—ঠিক আছে। এখনই জবাব দিতে হবে না। কাল বিকালে এস। কেমন?

সে রাত্রে সারারাত আমার ঘুম হল না। কার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করি? মায়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই নয়। আমার পিতৃহন্তাকে সাদি করার পর থেকে সে আমার মন থেকে অনেক-অনেক দূরে সরে গেছে। আজি-আম্মার সঙ্গে এসব বিষয়ে কথা বলা কি ঠিক হবে? মীনাবহিন মুখ-আল্‌গা লোক। এখনই হয়তো পাঁচকান হবে। স্থির করলুম, পরদিন শাহ্‌জাদার আমন্ত্রণ মতো তার মহলে যাব। শুধু শাহ্‌জাদা নয়, বহিনজী এটা কীভাবে নেবে সেটাও একটু বুঝে নেবার চেষ্টা করতে হবে।

পরদিন শাহ্‌জাদার মহলে যেতেই ওরা দুজন আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। নানান খাদ্য-পানীয়। আমি বা শাহ্‌জাদা মুখ খুলবার আগে বহিনজীই হঠাৎ আক্রমণ করে বসল আমাকে, হ্যাঁ-রে! তোর পেটে পেটে এত? তাই না ডাকতেই এ পাড়ায় ঘুরঘুর করতে আসা হয়, না-রে?

আমি অবাক হয়ে বলি, কী বলছ বহিন্‌জী? আমি তো···

—ন্যাকা! ভাজা-মাছটি উল্টে খেতে জানিস্ না, নয়? এদিকে তো বেশ কডমড করে শাহ্‌জাদার মুণ্ডু চিবাচ্ছিস্!

শাহ্‌জাদা খুররম্ শুয়ে ছিল অদূরে একটা কামদার গালিচায়। সোনার পরাতে রাখা একটা বসরাই গোলাপের দলগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পারস্য-গালিচায় ছড়িয়ে দিচ্ছিল আপন মনে। সেখান থেকেই বললে, তোমার বহিনজীর কাছ থেকে লুকিয়ে পার পাবে না লাড্‌লী। ও সব জানে।

—কী জানে?

—তুমি-আমি মহব্বতের শিকারায় উথাল-পাথাল দোল খাচ্ছি।

আমার মাথাটা নিচু হয়ে গেল। এ কি শ্যালিকার প্রতি রসিকতা? কথা ঘোরাবার জন্য বলি, কাল আপনি বলেছিলেন, সাদির আগেই আপনি একবার মহব্বতের শিকারায় উথাল-পাতাল দোল খেয়েছিলেন। সেই কিস্‌সাই তো শুনতে এসেছি। বলুন?

খুররম্ বুঝে নিল, আমি কথাটা ঘোরাতে চাই। তখন বুঝিনি, আজ বুঝতে

পারি—সে ছিল ওস্তাদ মৎস্যশিকারী। কতখানি সুতো কখন ছাড়তে হয়, জানে। বললে, বেশ শোন, সেই কিস্‌সা। বছর তিনেক আগে নওরোজ-বাজারেই তোমার দিদিকে প্রথম দেখি। ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়িয়ে পড়ি গিয়াস্‌-বেগ-এর পত্নী আসফৎ বেগমের দোকানে। সেখানেই চারচক্ষুর প্রথম মিলন।

আমি তখন মনে মনে ভাবছি—আশ্চর্য ঘটনাচক্র! সেই একই স্থান, একই বেগম-সাহেবার দোকান অথচ পাত্রপাত্রী কেমন বদলে গেছে!

শাহ্‌জাদা বলেই চলেছে, বেগম-সাহেবা ছিলেন একটু দূরে। তাঁর নাতনী, অর্থাৎ তোমার বহিনজী সওদা বেচছেন। আমি অবাক হয়ে যাই! একদৃষ্টে দেখতে থাকি তোমার দিদিকে। তখন তার বয়স চৌদ্দ…

—না পনের। —সংশোধন করে দিল পূর্ণগর্ভা আর্জুবানু।

—বেশ, না হয় পনেরই। তাকে তখন আমি চিনি না। একটু পরে মেয়েটি বললে, 'কী দেখছেন? কিছু কিনবার ইচ্ছা আছে?' আমি তাড়াতাড়ি ওর মেজ থেকে একটা কাচখণ্ড হাতে তুলে নিয়ে বলি, 'এই নকল হীরাটার দাম কত?' তোমার দিদি মুখ লুকিয়ে হাসল, বললে, 'ওটা বরং থাক, আপনি আর কিছু পসন্দ করুন।' আমি জানতে চাই, 'কেন? এটার কী দোষ হল? এটা তো চমৎকার নকল-হীরে?' আর্জুবানু বললে, 'ওটা আপনাকে বেচব না।' আমি ধমকে উঠি, 'বেচবে না, তাহলে সাজিয়ে রেখেছ কেন?'

আমার বিশ্বাস হয় না। বহিনজীকে বলি, সত্যি কথা? তুমি তাই বলেছিলে? বেচবে না?

আর্জুবানু বলে, 'বেচবে না' তা তো বলিনি, আমি শুধু বলেছিলুম 'আপনাকে বেচব না।'

আমি জানতে চাই, স্বয়ং বাদশাজাদাকেই যদি না বেচ, তাহলে তামাম দুনিয়ায় তুমি খরিদ্দার পাবে কোথায়?

আর্জু বললে, তোমার ভগ্নীপতিও সেই কথা বলেছিল। তার জবাবে আমি তাকে বলেছিলুম, 'খরিদ্দার এখনই আসবেন। খোদ্‌ শাহ্‌-য়েন-শাহ্‌! তিনি সাচ্চা জহুরী। ইমান-ইনসাফের-মালিক এক নজরেই বুঝতে পারবেন—এটা নকলি নয়, আসল হীরে।

শাহ্‌জাদার দিকে ফিরে বলি, সত্যি তাই?

—তাই! তাড়াতাড়ি ভুল হয়েছিল আমার। ওটা ছিল আসল হীরে।

—তাহলে বাকযুদ্ধে হার হল আপনার?

শাহ্‌জাদা অট্টহাস্য করে ওঠে। বলে, অত সহজে খুররম্‌ হার মানে না।

নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেই আমি অন্য একটা চাল চালি। বলি, এটা যে সাচ্চা বাদাক্শান তা তোমার শাহ্জাদাও জানে—কিন্তু তুমি এত জানো আর এটুকু জান না যে, সাচ্চা কমলহীরের পাশাপাশি রাখলে সব হীরেকেই নকল বলে মনে হয়? পসারিনীর জৌলুষেই তার হাতের হীরে জ্যোতি হারিয়েছে।

শাহ্জাদা তার পরেও অনেক কথা বক্বক্ করে গেল। দশ হাজার-আসরফি মূল্য দিয়ে ঐ হীরেটি নাকি খরিদ করেছিল। কৌশলে জেনে নিয়েছিল মেয়েটির পরিচয়। সেদিন থেকেই দুজনে দুজনের প্রেমে নাকি মাতোয়ারা। এ কথা কাকপক্ষীতে টের পায়নি। এমনকি মেহেরউন্নিসা যখন তার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে শাহ্জাদার বিবাহের প্রস্তাব তুলল, তখন না শাহ্জাদা, না আর্জুমান্দ—কেউই স্বীকার করেনি যে তারা পরস্পরকে চেনে।

গল্পটা আমার ভালো লাগেনি। আমি শুধু ভাবছিলুম—মাত্র তিন বছরের ভিতরেই যার হাতে কমলহীরে হয়ে যায় কাচখণ্ড সে কেমন জাতের শাহ্জাদা!

ভেবেছিলুম; কিন্তু চিন্তাটা মনে স্থায়ী হয়নি। কেন হয়নি, তখন বুঝিনি। আজ বুঝতে পারি। আমার অভিজ্ঞতার স্বল্পতা। না, তাও নয়—ওটা বোধহয় বয়সের ধর্ম। আমার একটা মন বলছিল—এ সাচ্চা নয়। এ শুধু আমার রূপ-যৌবনের প্রতি শাহ্জাদার সাময়িক আকর্ষণ। দুদিন পরে ও আমাকেও ঝুটো কাচখণ্ড বলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু আর একটা মন—যে মনটা এই পনের বছরের ভিতরেও কোন মুগ্ধ পুরুষের দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দেখেনি—সে মুগ্ধ হতে চাইছিল। সে পিটুলি গোলাতেও দুধের স্বাদ পেতে চাইছিল।

শাহ্জাদা খুররমের বয়স তখন কত? সামান্যই। বছর সতের-আঠারো। কিন্তু এ বিষয়ে সে পাকা খেলোয়াড় হয়ে উঠেছে। আমি তিল তিল করে ওর দিকে আকৃষ্ট হতে থাকি। তবে আমার মনের যে অংশটা বুঝমান, সে সতর্ক হয়ে থাকল। ধরা দেব না কিছুতেই, যতদিন না শাহ্জাদা পাকাপাকিভাবে বিবাহের প্রস্তাব করছে। না, তাও নয়—যতদিন না সাদিটা হচ্ছে।

এল সেইদিন। খুররম্ খোলাখুলি জানতে চাইল—আমি রাজী কিনা। রাজী থাকলে সে নূরজাহাঁর দ্বারস্থ হবে। কথাটা সে তুলল আর্জুবানুর সমুখেই। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকাই। বহিনজী খিল্খিল্ করে হেসে ওঠে। বলে, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিস্। উপায় কি বল? আবার দুবছর পরে শাহ্জাদার হয়তো আর কোন মেয়ের দিকে নজর পড়বে। তখন আজ আমি যা করছি, তোকেও তাই করতে হবে।

আমি বলি, দু-চার দিন ভেবে জবাব দেব।

জবাব আমাকে দিতে হয়নি। দিন-তিনেক পরে এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে সব কিছু গুলিয়ে গেল আবার। সেদিন আজি-আম্মা কিল্লাতে ছিল না। ওর ছেলে রুস্তম থাকে কিল্লার বাইরে। সে নাকি আসফ খাঁর বাহিনীতে সৈনিক হয়েছে। ইতিমধ্যে তাকে আর কোনদিন দেখিনি। দেখবার সম্ভাবনাও ছিল না। বাইরের পুরুষ কিল্লার ভিতরে আসতে পারত না। সেদিন আজি-আম্মা গেছে একদিনের ছুটি নিয়ে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে।

রাত্রে আমরা দুজন পাশাপাশি শুয়েছি : আমার আর মীনাবহিনের ঘুম আসছে না। জানলা দিয়ে একমুঠো জ্যোৎস্না এসে ছড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে। হঠাৎ নিজের পালঙ্কে উঠে বসল মীনাবহিন। বললে, লাড্‌লী, তোকে একটা গোপন কথা বল্‌ব। খুব গোপন! আল্লার নামে শপথ নিয়ে আগে বল, আর কাউকে বল্‌বি না।

আমি বলি, অমন একটা গোপন কথা নাইবা বললে মীনাবহিন?

—না, ব্যাপারটা তোকে নিয়েই। তোরই স্বার্থে। কিন্তু জানাজানি হলে আমার গর্দানা যাবে।

উঠে বসতে হল। কৌতূহল প্রবল, আমাকে নিয়ে? কী কথা? আচ্ছা, শপথ করছি কাউকে বলব না।

—তার আগে বল, শাহ্‌জাদা খুররম্-এর সঙ্গে তোর মহব্বৎটা কোন পর্যায়ে?

—মানে? তার সঙ্গে আমার মহব্বৎ চলছে এমন আজগুবি ধারণা তোর হল কোত্থেকে?

—লাড্‌লি! তুই যদি এমন করিস্ তাহলে কথাটা বলতে রাত কাবার হয়ে যাবে। হয় তো বলাই যাবে না। আর কেউ জানে না; কিন্তু আমি স—ব জানি। আমি জানতে চাইছি—সে যে তোকে সাদি করতে চায়, একথা বলেছে?

বুঝতে পারি, ওর কাছে লুকিয়ে লাভ নেই। বলি, হ্যাঁ। পরশু সন্ধ্যা বেলা।

—আর্জুবানু বেগম-সাহেবার সামনেই, নয়?

—তুমি তো সবই জানো দেখছি।

—না, সঠিক জানতুম না। আন্দাজ করেছি। তুই কী জবাব দিয়েছিস্?

—আমি হ্যাঁ-না কিছুই বলিনি। সময় চেয়েছি।

মীনাবহিন উঠে এল ওর পালঙ্ক থেকে। বসল আমার বিছানায়। আমার হাত দুটি তুলে নিয়ে প্রায় কানে-কানে বললে, তুই রাজী হসনি। কিছুতেই নয়। জান থাকতে নয়।

—কেন? কী হয়েছে?

একটা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা শোনালো মীনাবহিন।

আগের দিন রাত্রে তার ডাক পড়েছিল শাহ্‌জাদা খুররমের শয়নকক্ষে। হাকিম ওয়াদির আলি খান—আগ্রার সবচেয়ে নামী চিকিৎসক—দিন-দশেক পূর্বে নাকি দেখতে এসেছিলেন আর্জুবান্নুকে। হুকুমজারী করে গেছ্‌লেন—বেগম-সাহেবা রাত্রে শাহ্‌জাদার সঙ্গে আর শয়ন করতে পারবেন না। সন্তান আসন্ন এবং বেগম-সাহেবার ভবিষ্যৎ খুব ভাল নয়। শাহ্‌জাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন; কিন্তু কিছুই করতে পারেননি। বাধ্য হয়ে বাদশাহ্‌জাদার শয্যাসঙ্গিনীর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে হল। কাশ্মিরী বেগম—মানে কান্দাহারের যে রাজকন্যাকে খুররম্‌ ইতিপূর্বে সাদি করেছিলেন, তাকে আর পসন্দ হয় না। ফলে, ওঁর উপ-পত্নীদের পালা করে যেতে হত শাহ্‌জাদার শয়নকক্ষে। আর্জুবান্নুর নজর এড়িয়ে। কারণ শাহ্‌জাদা ধর্মপত্নীকে জানাতে ইচ্ছুক নন এ গোপনবার্তা। গতকাল ডাক পড়েছিল মীনাবহিনের।

সারাহ্‌-বাঁদীর নির্দেশ মতো দুই প্রহর রাত্রে সেজেগুজে ওকে আসতে হল শাহ্‌জাদার শয়নকক্ষে। সচরাচর আসন্ন-প্রসবা তার পূর্বেই ঘুমিয়ে পড়েন। খোজা-প্রহরী যখন মীনাকে পৌঁছে দিল তখন শাহ্‌জাদার শয়নকক্ষে স্বর্ণদণ্ডের খাশ্‌গেলাসে একটিমাত্র বাতি জ্বলছে। ঘরে কেউ নেই। যে বাঁদী ওকে পৌঁছে দিয়ে গেল সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, 'বাদশাহ্‌জাদা পাশের ঘরেই আছেন। বেগমের ঘরে। বেগম-সাহেবা এখনো জেগে আছেন। তুমি চুপ্‌পটি করে পালঙ্কে উঠে শুয়ে থাক। একটু পরেই শাহ্‌জাদা এ ঘরে আসবেন।'

বলেই প্রতিহারিণী নিঃশব্দ-চরণে অপসৃত হল।

মীনা বলতে থাকে, একটু পরেই জান্‌লি, দমকা হাওয়ার আলোটা গেল নিবে। প্রথমটা ঘোর আঁধার। তারপর অন্ধকারে একটু একটু করে চোখ সয়ে গেল। কালকেও অল্প অল্প জ্যোৎস্না ছিল। আমি পোশাক-আশাক না পাল্‌টে চুপটি করে বসে থাকি কার্পেটের এক প্রান্তে। শাহ্‌জাদা না ডাকলে পালঙ্কে উঠে বসার রেওয়াজ নেই, সেটা ঐ আহাম্মক বাঁদীটা জানে না। একটু পরেই শুনতে পাই—পাশের ঘরে ওরা দু-জন কথা বলছে। চরাচরে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। নিতান্ত মেয়েলী কৌতূহলে আমি দু-ঘরের মাঝের দরজার কাছে এগিয়ে যাই। ও-ঘরে জোরালো বাতি। মাঝের পাল্লাটার কপাট বন্ধ নয়, ভেজানো। এক চুল ফাঁক করে তাকিয়ে দেখি—শাহ্‌জাদা বসে আছেন পালঙ্কের উপর। তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন বেগম-সাহেবা। হঠাৎ তোর নামটা কানে যেতেই আমি চোখটা সরিয়ে কানটা পেতে দিই। শুনতে পেলুম, বেগম-সাহেবা অভিমান করে

বলছেন, 'কেন মিছে স্তোক দিচ্ছ আমাকে? আমি নিশ্চিত জানি—আমাকে পেয়ে তুমি যেমন কান্দাহারী শাহ্‌জাদীকে ভুলেছ, ঠিক তেমনি লাড্‌লীকে সাদি করার পর আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে।' আর শাহ্‌জাদা ওঁকে স্তোক দিচ্ছেন, 'তুমি বোকার মত কথা বল না, মমতাজ! কান্দাহারী রাজকন্যাকে কি সাধ করে সাদি করেছি? রাজনৈতিক কারণে। এবারও তাই। বুড়োটা যতদিন টিকে আছে ততদিন নূরজাহাঁর দাপট। খস্‌রৌটা অন্ধ, শরিয়তি কানুনে সে কোনদিনই বসতে পারবে না গদিতে। কিন্তু পরভেজ? সে আমার বড় ভাই। ভুলে যাচ্ছ কেন?'

—পরভেজ কী? —জানতে চাইলেন বেগম-সাহেবা।

—খস্‌রৌ যেহেতু তক্ত-সুলেমানের হক্‌দার হতে পারে না, তাই নূরজাহাঁ চাইবে পরভেজকে গদিতে বসাতে। পরভেজটা অকর্মণ্য; তাকে শিখণ্ডী করে নূরজাহাঁ তার কাজ হাসিল করবে। আর সেজন্যই ঐ কৈ-মাছটাকে জিন্দা রেখেছে। বুঝলে না?

—কৈ-মাছটাকে! মানে?

—নূরজাহাঁ এবার পরভেজের সঙ্গে ঐ লাড্‌লীর সাঙা দেবে। তার আগেই সে পথ বন্ধ করে দেওয় বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? তুমি কি ভেবেছ ওর মহব্বতে আমি বে-দিল হয়ে গেছি? তুমিই যে আমার দিল্‌তোড় মমতাজ-বেগম! কাজ হাসিল হলেই ঐ লাড্‌লী বেগমকে দূর দূর করে তাড়াবো।

তারপর বেগম-সাহেবা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। শাহ্‌জাদা এবার এ-ঘরে উঠে আসবে বুঝতে পেরে আমিও চট করে দূরে সরে আসি। একটু পরেই ঘরে ঢুকল শাহ্‌জাদা খুররম্…

অন্যদিন হলে আমি নিশ্চিত বলতুম: তারপর?

সে রাত্রে তা বলিনি বুঝতে পেরেছিলুম, এ অভাগীর বুকে একের পর এক শেলের আঘাত হানতে এসে আল্লাহ্ বদ্ধপরিকর। ছয় বছর বয়সে হারালো বাপকে, দশ বছর বয়সে মাকে দেখল পিতৃহন্তার সঙ্গে নিকায় বসতে। পনের বছরে জীবনে প্রথম ভালবাসল। সাতটা দিনের খোয়াব না কাটতেই শুনল সে জিওনো কৈ-মাছ। খুররম্ কৈ-মাছটাকে ছিপে খেলাচ্ছে গেঁথে তুলবে বলে। ক্লান্ত কণ্ঠে মীনাবহিনেরই পরামর্শ চাই, তুই কী করতে বলিস?

—সব কথা খুলে বল তোর মা-কে। বেগম-সাহেবাকে।

—আমাকে কেটে ফেললেও তা বলতে পারব না। মায়ের হাত থেকে কোন দান আমি নিতে পারব না। মাসখানেকের মধ্যে তাকে চোখেও দেখিনি।

— তবে আমাকে বলতে দে ?

—এই যে তুমি বললে পাঁচ-কান হলে তোমার গর্দানা যাবে ?

— পাঁচ-কান নয় এটা। তাছাড়া সব কিছু জেনেও যদি চুপ করে থাকি — নূরজাহাঁ বেগম-সাহেবাকে না জানাই, তাহলেই গর্দানার উপর মুণ্ডুটা থাকবে নাকি আমার ?

— যা ভালো বোঝ, কর !

নিশ্চয় তাই করেছিল সে।

আমার অনুমান নূরজাহাঁ কড়কে দিয়েছিল তার ভাইঝিকে। অথবা খুররমকেই। সে হিম্মৎ তখন ছিল নূরজাহাঁর। মোট কথা, আমি রেহাই পেলুম। আর আমার ডাক আসেনি খুররমের খাশ-মহল থেকে। নিষ্কৃতি পেলুম বলা চলে।

তবে কি পরভেজ ? তাকে কখনো দেখিনি স্বচক্ষে। শুনেছি, দিবারাত্র নেশাভাঙ করে পড়ে থাকে। যে সময়ের কথা, তখন পরভেজ আগ্রা কিল্লাতে থাকতও না। কোথায় থাকত তা আমার মনে নেই।

পরভেজ নয়, এরপর আমার জীবনে যে এসেছিল সে এক আশ্চর্য পুরুষ। তাকেও ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। নামটা শুনেছি — কিন্তু কোনও নাচগানের আসরে কখনো তাঁকে যোগদান করতে দেখিনি। যদিও তিনি থাকতেন কিল্লার ভিতরেই।

এ কয় বছরে হিন্দুস্তানের কোথায় কি লড়াই কাজিয়া হয়েছে, কোন এলাকা মুঘল সাম্রাজ্যে যুক্ত হয়েছে, কোনটাই বা হাতছাড়া হয়েছে তার হক্‌হদিস্ আমার জানা নেই। আমি শুধু বলতে পারি, আমার বয়স পনের থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে উনিশ। মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ কোনকালেই ছিল না, এতদিনে ছিন্ন হল মামাতো বোনের সঙ্গে সম্পর্ক। তার তিন-চারটি সন্তান হয়েছে, পিঠোপিঠি। মাঝে একটি মারাও গেছে। আমার যৌবন নিকুঞ্জে দণ্ডবায়সের কর্কশ নিনাদ শুদ্ধ হওয়ার পর এ চারটি বসন্তে আর কোনও দলছুট পাখি এসে ডাকাডাকি করেনি। অথচ আমার চারদিকে মদনদেবের কী উন্মত্ত লীলাখেলা। কিছু নজরে পড়ে, কিছু শুনি।

হারেমের সুরক্ষা কিন্তু খাতা-কলমে অটুট।

হারেম-নিরাপত্তার জন্য তিন জাতের ব্যবস্থা। প্রথমত তাতারী রমণীদের একটা অন্দর-বেষ্টনী। এরা অধিকাংশই আসত তুর্কীস্থান আর উজ্‌বেগিস্তান থেকে। অত্যন্ত বলশালী, অস্ত্রচালনায় দক্ষ আর খুব বিশ্বস্ত। বার্নিয়ারের বর্ণনায়, "যাদের তুলনায় স্কিথিয়ার পৌরাণিক নারী-যোদ্ধা আমাজনদেরও মনে হতে

পারে পেলব ও ব্রীড়ানম্র।" তারপর খোজাবাহিনী। তারাও হারেমভুক্ত। দিবারাত্র পাহারা দেয়। তিন নম্বর—হারেমের বাহির দিয়ে বেষ্টন করে থাকে এক বিশ্বস্ত পুরুষ বাহিনী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে—এই দুর্ভেদ্য নিরাপত্তায় হারেম-আব্রু কোনক্রমেই ব্যাহত হতে পারে না। কিন্তু, হত। বহিরাগত নাগরেরা আসত; হারেম-নারীরাও বাহিরে যেত। যত বজ্র-আঁটুনি ততই ফস্‌কা-গেরো। যারা পাহারা দিত তাদের উৎকোচে বশীভূত করা কঠিন হলেও অসম্ভব ছিল না।

তাতে অবশ্য আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। স্বয়ং শাহ্‌জাদা খুররম্‌ অপদস্ত হওয়ার পর থেকে আর সবাই বুঝে নিয়েছিল, নূরজাহাঁ-দুহিতার সঙ্গে প্রেম ট্রেম চলবে না। আগেই বলেছি, আমি নিজেও ছিলুম লাজুক প্রকৃতির। ক্রমে প্রায় একঘরে হয়ে পড়লুম। সাহচর্য বলতে একমাত্র আজি-আম্মার, সখীত্ব বলতে শুধুমাত্র মীনাবহিন।

তারপর একদিন।

সন্ধ্যা হব হব। পশ্চিম দিকের আকাশ তখনো লজ্জারুণ আভাটুকু মুছে ফেলেনি। মাঝে মাঝে ঝাঁক-ঝাঁক টিয়াপাখির দল উড়ে যাচ্ছে আগ্রা কিল্‌লার উপর দিয়ে। আমি আর আজি-আম্মা বসেছিলুম দ্বিতলের অলিন্দে। আজি-আম্মা আমার চুল বেঁধে দিচ্ছিল। হঠাৎ নজর হল, নিচে, আমাদের মঞ্জিলের প্রবেশ পথে একটি তাতারী প্রতিহারিণী আঙুল তুলে আমাদের দুজনকে দেখাচ্ছে। তার সঙ্গে একটি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে, বছর চার-পাঁচ বয়স হবে। পরনে পলাশ-লাল কুর্তা, হংসশুভ্র চোস্ত্‌। মাথায় মখমলের টুপি, তাতে পাথর বসানো। ছেলেটি ঘাড় নেড়ে তাতারী রমণীকে জানালো সে চিনতে পেরেছে। প্রতিহারিণী নিচে অপেক্ষা করল; বাচ্চা ছেলেটা সোপান বেয়ে উঠে এল দ্বিতলে। গট্‌ গট্‌ করে একেবারে আমাদের সামনে। মুঘল কায়দায় আমাকে অভিবাদন করে বললে, তুমিই লাডলী-আম্মা?

ছেলেটি কে, তা জানি না; কিন্তু ভারি মিষ্টি, ভারি সপ্রতিভ। আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি চাপল। ঘাড় নেড়ে বলি, না। এর নাম লাডলী-আম্মা—

আমার পিছনেই চুল-বাঁধতে ব্যস্ত আজি-আম্মাকে দেখিয়ে দিই।

—ও আচ্ছা। শোন,—এবার সে আজি-আম্মাকে বলছে—আমার আম্মা আমাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে···

মাঝপথেই থেমে পড়ে। বলে, ধু—স্‌। তুমি নও! সে অন্য কেউ! মা যে বললে, 'দেখবি খুব সুন্দরী, আমারই বয়সী'।

আজি-আম্মা ছদ্ম গাম্ভীর্যে বললে, তার মানে তুমি বলছ—আমি কুচ্ছিৎ?

ফর্সা গাল দুটি লাল হয়ে ওঠে। বলে, না, না, তা কেন ?

—তোমার নাম কি ?—জানতে চাই আমি।

—দাওয়ার বক্স।

কী সর্বনাশ! শাহ্-য়েন-শাহের বড়ছেলের বড়ছেলে! ন্যায্যত যে একদিন হবে হিন্দুস্তানের শাহ্-য়েন-শাহ্ স্বয়ং। তাড়াতাড়ি আমরা আদর অভ্যর্থনার আয়োজন করি। আমার একটা ময়ূর ছিল। ও তাকে খেতে দিল। এক-জোড়া খরগোশ ছিল, তাদের সঙ্গেও খেলা করল। আজি-আম্মা তাড়াতাড়ি নিয়ে এল রুপার রেকাবিতে নানান মেওয়া-মিষ্টান্ন। দাওয়ার বক্স কিছুতেই খাবে না। অনেক অনুরোধ উপরোধে দু-একটি আখরোট ভেঙে খেল শুধু। বললে, তার আম্মা আমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন পরদিন দ্বিপ্রহরে। তিনি নাকি অসুস্থা। তাঁর রোগমুক্তির জন্য খসরৌ স্বয়ং গিয়েছিলেন আজমীরে—খাজা মৈনুদ্দীন চিস্তির দরগায়, রজব্ মাসের উর্‌স উৎসবে শিরনি চড়াতে। কাল আমার প্রসাদ পাওয়ার নিমন্ত্রণ।

শাহ্জাদা খসরৌর স্ত্রী যে অসুস্থা এ খবর আমার জানা ছিল না। আজি-আম্মা অবশ্য জানত। জনান্তিকে আমাকে জানালো—অসুস্থতা কিছু নয়। সে সন্তানসম্ভবা; কিন্তু বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে। এজন্যই হাকিম-সাহেব চিন্তিত। আর সেজন্যই খসরৌ আজমীরে গেছিলেন ধর্না দিতে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আজি-আম্মা আমাকে পৌছে দিল শাহ্জাদা খসরৌর মহলে।

বেগম-সাহেবার ঘরটা প্রকাণ্ড। একটা পালঙ্কে তিনি শুয়ে ছিলেন। দু-চারটি কিঙ্করী তাঁর সেবা করছিল। একেবারে উত্থানশক্তি রহিতা নন, তবে দুর্বল। আমাকে তিনি কাছে ডাকলেন। বসলুম তাঁর পালঙ্কের পাশে একটি আসনে। বেগম-সাহেবার ইঙ্গিতে যারা খিদ্‌মৎ করছিল তারা বিদায় হল। শীর্ণকায় হাত দুটি বাড়িয়ে তিনি আমার ডান হাতটি টেনে নিলেন। বললেন, তোমার কথা অনেকের মুখেই শুনেছি, কখনো আলাপ হয়নি। একটা জরুরী প্রয়োজনে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি ভাই।

আমার চেয়ে বছর সাত-আটের বড়ই হবেন। মীনাবহিনের বয়সী। সুন্দরী; কিন্তু বর্তমানে খুবই রক্তশূন্য মনে হচ্ছিল আমার। আমি বলি, কথা বলতে কি কষ্ট হচ্ছে আপনার ?

—না, না। সারাদিনই তো লোকজনের সঙ্গে গল্প-গাছা করি। কষ্ট হবে কেন ?

—বলুন কী জন্যে ডেকেছেন ?

—তার আগে বল দিকিন—তুমি কি আমার উপর রাগ করে আছ?

সত্যই বিস্মিতা হই। বলি, কেন? আপনার উপর রাগ করব কেন?

—তোমার মা একটা সম্বন্ধ তুলেছিলেন। তোমার সাদির! আমার জন্য—

—এসব কী বলছেন আপনি। ছি ছি! তা কেন?

—আমি তোমার সব কথা জানি। ছেলেবেলার কথা থেকে, এই সেদিন যে ঘটনা ঘটেছে খুররমকে জড়িয়ে। আমি তোমার দিদির মতো। কোন সঙ্কোচ কর না আমাকে। তোমাকে কেন ডেকেছি সেটা আন্দাজ করতে পার?

—জী না। কেন?

—হাকিম-সাহেব আশঙ্কা করেছেন, এবার সন্তান হতে গিয়ে আমার মৃত্যু হতে পারে···

—না, না, না! এসব কথা বলবেন না!

বেগম-সাহেবা আমার মুঠিতে একটু চাপ দিয়ে বললেন, আমার যা বলার আছে তা আমাকে বলতে দাও লাডলী-বহিন। হয়তো বলার সুযোগ আর কোনদিনই আমি পাব না। যদি সন্তান কোলে নিয়ে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে আসি, তাহলে বরং ভুলে যেও আজ তোমাকে আমি কী বলেছি। কেমন?

—বেশ, বলুন।

—আমার বড়ছেলেকে তুমি দেখেছ, দাওয়ার বক্স। বছর-পাঁচেক বয়স হয়েছে তার। লায়েক হয়েছে বলতে পার। পেটে যেটা আছে সেটা ছেলে না মেয়ে আল্লাই জানেন। তবে তার সম্বন্ধেও আমার কোন চিন্তা নেই। কিন্তু মরেও আমি শান্তি পাব না, আর একটি অনাথের ব্যবস্থা না করে গেলে··

—অনাথ! কার কথা বলছেন বেগম-সাহেবা?

—শাহ্‌য়েন-শাহ্‌ জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র: অন্ধ বাদ্‌শাজাদা!

আমি নির্বাক। উনি বলতে থাকেন, লোকটা অন্ধ। কিন্তু এমন মহান হৃদয় হিন্দুস্তানে খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। আমি যখন থাকব না, তখন যে কারণে তিনি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন···

আমি ওঁর মুঠি থেকে হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে ওঁর মুখে চাপা দিই। অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠি. বলবেন না! অমন কথা বলবেন না!

উনি ধীরে ধীরে আমার হাতটা সরিয়ে দিলেন। বললেন, বুঝেছি। থাক। সত্যই তো! এমন মানুষকে তুমি কেমন করে বরদাস্ত করবে? সে তো তোমার এই ভুবনমোহিনীরূপ দু'চোখ ভরে দেখবে না কোনদিন!

আমার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। কেমন করে ওঁকে বোঝাই, আমার

বুকের মধ্যে তখন কী জাতের ঝড় বইছে।

ঠিক তখনই দ্বার-প্রান্তে তাতারী প্রতিহারিণী পর্দাটা তুলে কী একটা ঘোষণা করল। করেই অন্তরালে সরে গেল। বেগম-সাহেবা আধশোয়া হয়ে উঠে বসেন। আমি সচকিত হয়ে বলি, ও কী বলল ?

— শাহ্‌জাদা আসছেন !

পরমুহূর্তেই দ্বারের স্বর্ণখচিত পর্দাটা দুলে উঠ্‌ল। দেখতে পেলুম, দীর্ঘদেহী এক পুরুষকে। আমার কী-জানি-কেন দুরন্ত সরম হল। বোধকরি পূর্বমুহূর্তের ঐ প্রস্তাবের ঝড়টা আমার অন্তরে শান্ত হয়নি। আমি এক ছুটে ঘরের ও-প্রান্তে চলে যাই। একটা মর্মর-স্তম্ভের আড়ালে আত্মগোপন করি।

কোথাও কিছু নেই খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে ওঠেন বেগম-সাহেবা। শাহ্‌জাদা পালঙ্কের দিকে ধীর পদে এগিয়ে আসছিলেন ; হঠাৎ বেগমের ঐ অট্টহাস্য শুনে মাঝ পথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে কী যেন ভেবে নেন কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর তিনিও দু-হাত মাজায় দিয়ে অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন। আমি স্তম্ভের আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখছি এই দৃশ্য !

বেগম-সাহেবা হাসি থামিয়ে শাহ্‌জাদাকে প্রশ্ন করেন, মানে ? তুমি হাসছ কেন ?

শাহ্‌জাদা ও হাস্য সংবরণ করে বলেন, ঠিক যে জন্য তুমি হাসছ !

— কক্ষনো নয়। বোকারা তিনবার হাসে। তোমার মাত্র একবার হল ! শাহ্‌জাদা বলেন, আলবৎ ! তোমারও যে দু-দুটো অট্টহাস্য বাকি !

না। আমি বুঝে হেসেছি। তুমি না বুঝে হেসেছ। আমার হাসি শুনে হেসেছ। ফলে তোমারটাই 'বোকার হাসি'।

শাহ্‌জাদা এতক্ষণে বসে পড়েছেন আমার পরিত্যক্ত আসনে। বেগম-সাহেবার হাতটি তুলে নিয়ে বলেন, বুদ্ধি থাকা ভাল, কিন্তু বুদ্ধির অভিমান নয় ! তুমি-আমি একই কারণে হেসেছি, বুঝলে ?

— না বুঝি নি। বলতো, আমি কেন হেসেছিলাম ?

আমি যেদিকটায় লুকিয়ে বসেছিলুম সেদিকে আঙুল তুলে শাহ্‌জাদা বললেন, ঐ বোকাটা জেনেও জানে না যে, তাদের যুবরাজের কাছে চক্ষুলজ্জা অহেতুক !

বেগম-সাহেবা স্তম্ভিত। বলেন, ওখানে কে আছে, বল-দিকিন্‌ ?

শাহ্‌জাদা বেগম-সাহেবাকে জবাব দিলেন না। অন্ধ চোখের দৃষ্টি আমার দিকে মেলে ধরে বলেন, আমাকে দেখে লুকাবার কিছু নেই লাডলী-বহিন্‌। এস, এখানে এসে বস। আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ওঁকেই বলি, আপনি কেমন করে আন্দাজ করলেন ?

—খুব সহজে ! ঘরে প্রবেশ করেই একটা চুড়ি-বালার জল-তরঙ্গ শুনেছি। কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে শব্দটা ছুটে গেল তা জেনেছি। বেগম-সাহেবাকে অহেতুক অট্টহাস্য করতে স্বকর্ণে শুনেছি। আর আজ দ্বিপ্রহরে তোমার যে নিমন্ত্রণ আছে এ খবরটাও আমার জানা। ফলে, এক নম্বর হাসিটা হেসে নিলাম। শুনলে না, বোকারা তিনবার হাসে ?

আশ্চর্য মানুষ !

আগেই বলেছি, আবার বলি, জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র যদি তক্ত্-স্থলেমানে আসীন হতেন, তাহলে হয়তো হিন্দুস্তান বঞ্চিত হত 'তাজমহল' থেকে। কিন্তু তার পরিবর্তে গোটা হিন্দুস্তানই তাজমহলের মতো নয়নাভিরাম হয়ে উঠ্‌ত ! যেমন হতে শুরু করেছিল শাহ্-য়েন-শাহ্ শের-শাহ্-র মাত্র পাঁচ বছরের শাসনে ; যেমন হচ্ছিল জালালুদ্দীন আকবরের জমানায়।

সারাটা দিন যে কী আনন্দে কাটল কী বলব ! শাহ্জাদা জানতে চাইলেন আমার কথা। আমার শিশুকালের কথা। আব্বাজানকে আমার মনে পড়ে কিনা। বললেন, শুনেছি পাট্টা জোয়ান ছিলেন তিনি—খালি হাতে শেরকে খতম করেছিলেন। দেখিনি তাঁকে। জানতে চাইলেন, বাংলামুলুকের গাছপালা-পশুপাখি-আবহাওয়ার খবর। ওখানে 'লু' বয় না, না ? কিন্তু গরমিকালে সন্ধ্যার সময় নাকি খুব ঝড়-জল হয় ? বাচ্চারা আম কুড়াতে দৌড়ায় ? তুমি কখনো ঝড়ের রাতে আম কুড়িয়েছ ? নিজেদের বাগানে ? আর কে আম কুড়াতো তোমার সাথে ? ⋯ ও ! রুস্তম্ বুঝি তোমার 'দুধভাই' ? এখন সে কোথায় থাকে ? তোমাদের দেশের মাঝি-মাল্লারা নাকি এক বিচিত্র স্থরে গান গায়—শোননি ? আর কীর্তন ? কীর্তন শুনেছ নিশ্চয় ?⋯ও মা ! তাও শোননি ? তা' তো হতেই পারে। তুমি যে তখন খুব ছোট।

বলেই, শুরু করলেন একটা গানা : 'তিমির দিক ভরি ঘোর যামিনী, অথির বিজুলিয়া পাঁতিয়া—'

একটিমাত্র চরণ গেয়েই তিনি কেমন উদাস হয়ে গেলেন। আশ্মানের দিকে দৃষ্টিহীন দৃষ্টি মেলে নিশ্চুপ বসে রইলেন কয়েকটা মুহূর্ত। 'কীর্তন' কাকে বলে আমি জানতুম না। কিন্তু ঐ গানটা শুনেছি। আমি যখন খুব ছোট্ট তখন বর্ধমানে একটা ভিখারী এসে অনেক গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করত। তার পরনে থাকত একটা জাফরানি রঙের আলখাল্লা ; মাথায় চুড়ো করে বাঁধা চুল, হাতে

অদ্ভুতদর্শন একটা বাদ্যযন্ত্র—তাতে একটা মাত্র তার, আর তার এক-পায়ে বাঁধা ঘুঙ্ঘট্! তাকেই কীর্তন বলে নাকি? আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল পরের লাইনটা। আমি গেয়ে উঠি; "বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙাইবি হরি বিনে দিন রাতিয়া!"

শাহ্‌জাদা একেবারে লাফ দিয়ে ওঠেন, কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ,! এই তো তুমিও জানো ব্রজবুলী। তবে যে বল্‌ছিলে 'কীর্তন' কাকে বলে জান না?

বেগম-সাহেবা বলেন, লাডলী তোমার 'ভুলে যাওয়া গান'টার পাদপূরণ করে দিল!

শাহ্‌জাদা হাসলেন। বলেন, ভুলিনি গো! তুমি বোধহয় ঐ গানের মানেটা বুঝতে পারনি, শোন।

উর্দুতে অনুবাদ করে শুনিয়ে দিলেন অর্থটা। বললেন, প্রথম চরণটি গেয়েই আমার মনে হল, আমি হতভাগ্য! বিদ্যাপতির মতো আমার অন্তরও কেঁদে কেঁদে বলতে চাইছে আল্লাহ্-র মুবারকী ছাড়া কেমন করে জীবনব্যাপি বিফল রাত্রিটা কাটাবো; কিন্তু আমার জন্যে আল্লাহ্ শুধু 'তিমির দিক ভরি ঘোর যামিনী'র ব্যবস্থাই রেখেছেন,—এ দৃষ্টির সম্মুখে নেই কোনও 'অথির বিজুলিয়া পাতিয়া!'

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল শাহ্‌জাদার।

বেগম-সাহেবা বললেন, কে বলে নেই? এই যে এইমাত্র আধখানা গানের কলি পূর্ণ হতেই তুমি 'কেয়াবাৎ' দিয়ে উঠ্‌লে এটাই কি আল্লাহ্-র শীরীন খিলাতের মুবারকী নয়? বিদ্যুতের চমক নয়?

শাহ্‌জাদা পুনরায় 'কেয়াবাৎ' দিয়ে ওঠেন। বেগমের হাতখানা টেনে নিয়ে বলেন, তোমার মতো, দিদাবর সহধর্মিণী লাভ করাও এক বেহেস্ত্-ই মুবারকী! আমার ভুল তুমি এভাবেই শুধ্‌রে দিও!

আমার মনে হল - কী আশ্চর্য! ইনসানিয়ৎকে আমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখি, আর তাই ভুল করি! মেঘে-ঢাকা অমাবস্যার নীরন্ধ্র অন্ধকারেও খদ্যোৎ জ্বলে—চোখ থাকলে দেখতে পাবে; দূষিত জলাশয়ের পঙ্কিল পরিবেশেও ফোটে পদ্মফুল! এই যে আগ্রা কিল্‌লা—যেটাকে কৃমিকুণ্ড বলে মনে হত এতদিন—শুধু হিংসা, হানাহানি, ভ্রাতৃবিরোধ আর কামনা-বাসনার ইন্দ্রিয়জ রিরংসা—সেখানেও লোকচক্ষুর অন্তরালে আছে এমন একটি স্বর্গীয় একান্ত প্রেম। শাহ্‌জাদা খস্‌রৌর এই একপত্নিক একমুখী একান্ত প্রেমের কথা লেখা থাকবে না ইতিহাসে! যেহেতু সে প্রজার রক্তশোষণ করে কোন তাজমহল বানিয়ে যায়নি! অবশ্য সেদিন সেখানে আমার এসব কথা মনে হয়নি; আজ লিখতে বসে হচ্ছে।

একটু পরেই দাওয়ার বক্স এল নাচতে নাচতে। তার বগলে কী একটা পুঁটুলি। তার মাকে বললে, আজ তো আমরা চারজন আছি, একটু 'লুডুস্' খেল না আম্মাজী?

শাহ্‌জাদা বলেন, এমন কিছু বেলা হয়নি। এস একপাটি খেলা যাক।

আমি বলি, কিন্তু ও-খেলার যে আমি কিছুই জানি না?

—তাতে কী? ও সহজ খেলা। এক লহমায় শিখিয়ে দেব, এই শোন—

অনেকটা আমাদের 'গোলকধামের' মতো। চারজনের চার-রঙা ঘুঁটি, চারটে করে। আর আছে শতরঞ্চের মতো একটা পাশষ্টি, অক্ষক্রীড়ার মতো তিনটি নয়, একটি ঘনক। তার গায়ে এক থেকে ছয়টি ফোঁটা। একটা চোঙার মত···

এই দেখুন, কাকে কী বল্‌ছি! আমাদের আমলে খেলাটা সগু-আমদানি। আসলে ওটা 'লুডো'-র প্রাথমিক অবস্থা। শাহ্‌জাদা বললেন, একজন আংরেজ বণিক ঐ খেলার সরঞ্জাম উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে। 'আংরেজ' বল্‌তে কী বোঝায় তাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—আগ্রা থেকে পশ্চিম দিকে চলতে থাকলে কাবুল, কান্দাহার, বসরা, বাগদাদ অতিক্রম করে তুমি পৌছাবে একটা আজীব রাজ্যে, যেখান থেকে বহু-বহু বরিষ পহিলে এসেছিলেন দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শাহ্। তার রাজ্য ছাড়িয়েও যদি পশ্চিমমুখে চলতে থাক, তবে পৌছাবে ঐ আংরেজদের দেশে। সে-রাজ্যের তক্ত-স্থলেমানে আসীন একজন মহিলা—আমাদের হিন্দুস্তানে যেমন এককালে ছিলেন স্থলতানা রিজিয়া। সে সম্রাজ্ঞীর নাম: এলিজাবেথ।

দাওয়ার আর বেগম-সাহেবা খেঁড়ি হলেন, আমি আর শাহ্‌জাদা দু'জন খেঁড়ি হলুম। লুডুস-এর প্রতিটি চৌখুপি নম্বর দেওয়া। প্রতিটি চালে আমাদের বলে দিতে হচ্ছিল খেলা কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

দাওয়ার পাঁচ দানে নিজের সবুজ-ঘুঁটিকে পাঁচ-ঘর অগ্রসর করে দিয়ে বললে, আমার তিন নম্বর ঘুঁটিটা বাহান্ন নম্বর ঘর থেকে সাতান্নে এল, আব্বাজান।

আমি তখন কাঠের চোঙায় পাশষ্টিটা নাড়াচাড়া করছি - এবারে দান দেব।

শাহ্‌জাদা খপ্ করে আমার হাতটা চেপে ধরে বললেন, লাডলী, তোমার এক নম্বর ঘুঁটিটা আগের চালে সাতচল্লিশ নম্বর ঘরে এসেছিল না?

আমি দেখে নিয়ে বলি, হ্যাঁ!

—ব্যস্! এবার তোমাকে ছয়-চার দানতে হবে! নাও, দান চালো—ছয়!

আমি দান ফেলি। ছয়-ই পড়েছে! ছয় হলে আবার দান পাওয়া যায়।

শাহ্‌জাদা বলেন: চার!

এবার দান ফেলতেই হল—চার!

শাহ্‌জাদা শিশুর মতো লাফিয়ে ওঠেন : তু নে কামাল কিয়া, লাডলী-বহিন্‌ !

পাকাঘুঁটি বেমক্কা মার খাওয়ায় দাওয়ার বক্স‌ও চটে উঠে উল্টে দিল ‘লুডুস্‌’-এর ছক ! ওদের নিশ্চিত হার হবে বুঝতে পেরে :

বলে, খেল্‌ব না ! তুমিও সেই শকুনির মতো মন্তর পড়ে দিয়েছ !

শাহ্‌জাদার অট্টহাস্য আর থামেই না

আমি বলি, শকুনি কে ?

দাওয়ার বলে, ঐ যে কাফেরদের কী একটা কিস্‌সা আছে···

হঠাৎ হাসি থামিয়ে শাহ্‌জাদা ধমক্‌ দিয়ে ওঠেন : জুন্না !

দাওয়ার অপ্রস্তুত। উঠে দাঁড়ায়। মাথা নিচু করে বলে, মাফি কিয়া যায় ! ম্যয়নে গল্‌তি কিয়া। ‘কাফের’ নহী, ম্যয়নে কহ্‌নে চাহ্‌তা কি ‘হিন্দুভাইলোগোঁ’ !

—ও হি বোলো !

শাহ্‌জাদা আমার দিকে ফিরে বলেন, তুমি ফার্সী পড়তে পার লাডলী ?

—জী হাঁ !

—তাহলে আমার গ্রন্থাগারে এসে অনেক অনেক বই পড়তে পার—হামজানামা, জায়ফরনামা, আকববনামা, মহাভারত, নল-দময়ন্তী-কথা। আকবর বাদশাহ্‌র কীর্তি। মীর সৈয়দ আলিব স্বহস্তে আঁকা ছবিও আছে তাতে।

আমি বলি, খুব ভাল হয় তাহলে।

—তুমি সারাদিন কী কর ? গান গাও ? ছবি আঁক ?

—গান আমার আসে না ; তবে ছবি আঁকতে খুব ইচ্ছা করে। কার কাছে শিখব ?

—তাই নাকি ? তাহলে এক কাজ কর। রোজ সকালে এখানে এক-প্রহর বেলায় চলে এস। দাসবন্দজী দাওয়ার বক্স আর দারাশুকোকে ছবি আঁকা শেখাতে আসেন : তুমিও শিখতে পারবে।

আমি সানন্দে স্বীকৃত হই।

দাওয়ার বক্স ইতিমধ্যে তাঁর লুডুস-এর সরঞ্জাম তুলে রেখে ফিরে এসে চুপটি করে বসেছে। ঠিক তখনই ওপাশের মেজ-এর উপর বিচিত্র-দর্শন একটা যন্ত্রে অদ্ভুত একটা দৃশ্য নজরে পড়ল আমার। কাচেব খাশ্‌গেলাস উবুড় করে যন্ত্রটা ঢাকা দেওয়া। তার ভিতর দেখতে পেলুম একটা ছোট্ট পাখি দোর খুলে বের হয়ে এল। ‘কুক্‌-কুক-কুক্‌’ করে বার কতক ডেকে আবার সুড়ুৎ করে খোপের ভিতর ঢুকে গেল। ইতিপূর্বে পাখিটা অমনভাবে খেয়াল মাফিক ডেকেছে।

সত্যিকারের পাখি নয়, যন্ত্রের পাখি। কৌতূহল হল। আমি জানতে চাই—ওটা মাঝে মাঝে অমন করে ডাকছে কেন?

—মাঝে মাঝে নয়, প্রতি ঘণ্টায়।

—'ঘণ্টা' মানে?

—'ঘণ্টা' মানে এক প্রহরের তিনভাগের একভাগ।

উনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন—ওর নাম—'ঘড়ি'। ঐ যন্তরটাও একজন আংরেজ-এর উপহার। তাঁর নাম, স্যার টমাস্ রো। ঐ কোকিলটা প্রতি ঘণ্টায় আওয়াজ করে জানিয়ে দেয়—বেলা কত হল, অথবা রাত কত গভীর। দাওয়ার বক্সকে বললেন, ওটা সাবধানে নিয়ে এস তো মুন্না।

বাধা দিলেন বেগম-সাহেবা, না না, ও ভেঙে ফেল্বে। লাডলী-বহিন তুমিই ওটা নিয়ে এস।

পুনরায় আমার মণিবন্ধ চেপে ধরে বাধা দিলেন শাহ্জাদা। স্ত্রীকে বললেন, দায়িত্ব না দিলে দায়িত্ব পালন করতে শিখবে কি করে? না, মুন্না, তুমিই নিয়ে এস। কিন্তু খুব সাবধানে। ওটা কাচের তো, একটু ধাক্কা লাগলেই ভেঙে যাবে।

'ঘড়ি' কাকে বলে, 'ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ড' সবই শিখে নিলুম এক দুপুরে।

দ্বিপ্রাহরিক আহার করতে হল বেগম-সাহেবার ঘরেই। সচরাচর ওঁরা অবশ্য খানা কামরায় খেতে যান; কিন্তু এখন বেগম-সাহেবা অসুস্থা। তাই এই বিকল্প ব্যবস্থা।

বেগম-সাহেবার অবশ্য রোগীর পথ্য; কিন্তু আমাদের তিনজনের হরেক রকম আমিষ নিরামিষ পদ। আর পরিবেশনের কায়দাটাই বা কি বিচিত্র! এক-একটি পদ পরিবেশনের পর ভুক্তাবিশিষ্ট উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আসছে হাত ধোওয়ার পাত্র এবং ভৃঙ্গারে জল। দ্বিতীয় পদটি আহারের পূর্বে হাত ধুয়ে নিতে হবে—না হলে সারাহ্-বাবুর্চি এত যত্ন নিয়ে যা তৈয়ার করেছে তার স্বাদ ঠিক মতো পাবে কি করে? মুর্গ্-মশল্লমের রসুনের গন্ধ ফিরনির স্বাদ নষ্ট করে দেবে না?

আহারকালেও নানান গল্প-গাছা হল। আমি বলি, শাহ্জাদা, আপনি তখন জানতে চাইলেন—আমার দিন কেমন করে কাটে। কিন্তু আপনার সময় কাটে কীভাবে? আপনি তো পুঁথিও পড়তে পারেন না—

জবাব দিলেন বেগম-সাহেবা, ওঁর কথা আর জানতে চেও না লাডলী-বহিন! ওঁর তো নিঃশ্বাস ফেলার ওয়াক্ত নেই। ওঠেন রাত থাকতে। গিয়ে বসেন

ছাদে। আপন মনে কী সব মন্ত্র আওড়ান! খানিকটা আরবি, খানিকটা সংস্কৃত। রোজ সূর্যোদয় দেখা চাই—

আমি অবাক হয়ে বলি, সূর্যোদয় 'দেখা'?

শাহ্জাদা হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ লাডলি! সূর্যোদয় 'দেখা'! আমি তো জন্মান্ধ নই। আলোর বোধও আমার আছে। ধীরে ধীরে সূর্যদেব যখন দিগ্বলয় ছেড়ে উঠে আসেন, তখন চোখের পাতায় তাঁর উত্তাপ, তাঁর রোশ্নাই, তাঁর মুবারকী অনুভব করি। আমার মনে পড়ে যায়, কাশ্মীরে দেখা সূর্যোদয়ের দৃশ্য। তাছাড়া আল্লাহ্ আমার চোখদুটির সামনে থেকে নিজেই সূর্যরশ্মির রহস্যটা অপাবৃত করে দিয়েছেন—

—'অপাবৃত' কি?

—আবরণ উন্মোচন। ঈশ-উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে। ঋষি বলছেন, হে পূষন্, হে সূর্য—তোমার রশ্মির ঐ চোখ-ধাঁধানো জ্যোতি আমার দৃষ্টি থেকে 'অপাবৃত' করে দাও, যাতে তোমার কল্যাণময় সত্তাস্বরূপ আমি উপলব্ধি করতে পারি। সুতরাং চোখ খুলে তো সূর্যের স্বরূপ বোঝা যায় না, লাডলা-বহিন!

বেগম-সাহেবা বলেন, ওসব ভারি ভারি বাৎ থাক। শোন লাডলী! তারপর সকাল ছয়টা থেকে আটটা একজন মৌলভী এসে তাঁকে কোরান-পাঠ করে শোনান। নয়টা থেকে এগারোটা এক পণ্ডিতজী কী সব অং-বং-চং শেখান। এভাবে একের পর এক গুণিসমাগম হতে থাকে। এ ঘরে যে একজন অসুস্থ মানুষ পড়ে আছে, সেটা খেয়াল করার ওয়াক্তই হয় না ওঁর।

ছয়টা, আটটা, নয়টা বুঝতে আর অসুবিধা হয় না আমার, যেমন বুঝতে অসুবিধা হয় না—শেষের কথাগুলি অভিমানের নয়, অনুরাগের।

নিজের মহলে ফিরে এলুম সন্ধ্যা নাগাদ। আবার ঐ একই কথা মনে হচ্ছিল—চোখ থাকলে দোজকেও দেখতে পাবে বেহেস্ত্-ই মুবারকী! এই আগ্রা কিল্লার পঙ্ককুণ্ডেও নজর করলে দেখতে পাবে সহস্রদল-মেলা পদ্মফুল। তবে ঐ! চক্ষুষ্মান হওয়া চাই। জাহাঙ্গীর-শাহ্জাহাঁ বা পারভেজের মত অন্ধ হলে তা দেখতে পাবে না। দেখতে পাবে—শাহ্জাদা খসরৌর মতো চক্ষুষ্মান হলে!

মীনাবহিনকে সব কথা বলেছিলুম। আদ্যোপান্ত শুনে বললে, খোদা না করুন যদি দাওয়ার বক্সের আম্মাজান সন্তান প্রসব করতে গিয়ে···

আমি ওর মুখ চেপে ধরি: ও-কথা ব'ল না মীনাবহিন!

—আমি তো বলেছি, খোদা না করেন—

—খোদা করুন-না-করুন, আমি তা পারব না :

ভ্রূকুঞ্চিত হল মীনা-বহিনের। বললে, কেন? শাহ্‌জাদা দৃষ্টিহীন বলে?

—না—না—না! সেজন্য নয়। ওঁর চেয়ে চক্ষুষ্মান মরদ এ কিল্‌লায় দ্বিতীয় নেই—

—তবে কী জন্য?

—কী জান মীনা-বহিন! আজ সারাটি দিন মনে হচ্ছিল আমি যেন সেই ছোট্টটি হয়ে গেছি। আর আমার আব্বাজান যেন তেমনটিই আছেন! শাহ্‌জাদা খস্‌রৌর ভিতর আজ আমি খুঁজে পেয়েছি আমার হারানো বাপ্‌কে। আমি··· আমি ঠিক বোঝাতে পারব না!

মীনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, বুঝিয়ে বলতে হবে না লাডলী! তোর অবস্থা আমি বুঝতে পারছি! আমার একটা ছোট্ট বোন ছিল—আজ তের বছর ধরে তাকে আমি খুঁজেছি। এতদিনে মনে হচ্ছে তাকে খুঁজে পেয়েছি তোর ভিতর। আব্বাজান বলতেন···

হঠাৎ মাঝপথেই থেমে যায়। আমি তাগাদা দিই, কী বলতেন তিনি?

—তুই আমার কথা কিছুই জানিস না, না রে লাডলী?

—কেমন করে জানব? যতবারই জানতে চেয়েছি তুমি এড়িয়ে গেছ। ব্যথা পাবে বলে আমিও পীড়াপীড়ি করিনি।

—আজ তোকে বলব, শোন—

মীনাবহিন সেই রাত্রে জানিয়েছিল তার নিরবচ্ছিন্ন বঞ্চনার ইতিহাস। নিতান্ত গরিবঘরের মেয়ে। কান্দাহার শহরের কাছাকাছি ওদের বাড়ি। ওর আব্বাজান ছিলেন স্থানীয় মক্তবের মৌলভী। ধর্মভীরু, শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ছিল কিছু ক্ষেতখামার ; রাজ-সরকার থেকে কিছু মাসোয়ারাও পেতেন। সংসারে চারটি প্রাণী। মৌলভীসাহেব, তাঁর স্ত্রী, আর দুটি কন্যা। মীনা বড়, ওর বোন আমিনা ছিল বছর সাতেকের ছোট। একজোড়া ভইষ্‌ ছিল। মা তাদের দেখ্‌ভাল করত। ছোট্ট ক্ষেতিতে ছিল আপেল, আখরোটের গাছ। ছোট বোন্‌টার ছিল দিদি-অন্ত প্রাণ। মুঘল বাহিনী আসছে শুনে মৌলভীসাহেব তাঁর মক্তবে ছুটি করে দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে দোরে আগড় দিলেন। সমস্ত গ্রাম সৈন্যরা লুণ্ঠন করল। ওদের বাড়িতে তারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আগুনের উত্তাপ সইতে না পেরে স্ত্রী-কন্যার হাত ধরে বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। মীনা-বহিনের চোখের সামনেই একজন সৈনিক শিরশ্ছেদ করল মৌলভীর। বাধা দিতে গিয়েছিল ওর ছোট বোন—আমিনা! তরোয়ালের এক কোপে তাকেও

কেটে ফেলল আর একজন সৈনিক। দুরন্ত ভয়ে মীনা জড়িয়ে ধরেছিল তার মাকে—তিনি তখন সংজ্ঞাহীনা। তিন-চারজন এসে জোর করে মা-মেয়ের আলিঙ্গন ছাড়িয়ে দিল।

—আমাকে ওরা টানতে টানতে নিয়ে চলল একদিকে। মা তখনও জ্ঞানহীন। দু-তিনজন তাঁকে বিবস্ত্রা করছিল। মাকে তারপর আর কোনদিন দেখিনি। জানি না, তিনি আজও জিন্দা কি না।

আমি বাধা দিয়ে বলি, থাক মীনাবহিন! আর শুনতে চাই না আমি—

—না, বলতে যখন শুরু করেছি, তখন সবটাই বলব। আমার বয়স তখন তের। নিতান্ত কিশোরী। কান্দাহার শীতের দেশ—আমি তখনও নারীত্ব লাভ করিনি, বালিকাই বলা চলে। কিন্তু ঐ বয়সেও কিছু কিছু জানতাম—নরনারীর সম্পর্কের কথা। মুঘল-শিবিরে আমাকে ওরা হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে দিল। আশ্চর্য! আমার গায়ে কেউ হাত দেয় নি। বুকের কাঁচুলিটা খুলেও দেখতে চায়নি কেউ। তারপর ওরা আমাকে পাল্কীতে করে নিয়ে এল লাহোরে। শাহ্‌জাদা সেলিমের বয়স তখন ছাব্বিশ। খস্‌রৌ, পারভেজ, খুররম্-এর তখন জন্ম হয়েছে। আগ্রা-কিল্লায় তখন তার দু-তিনটি বিবাহিতা-স্ত্রী, অসংখ্য উপপত্নী। সেই সেলিমের শিবিরে ত্রয়োদশী বালিকাকে নিয়ে ঐ সিপাহ্‌শালার উপস্থিত হল। আমার সারা দেহ বোরখায় ঢাকা। সেলিম আধশোয়া অবস্থায় মদ্যপান করছিল। যে আমাকে নিয়ে এসেছিল সে একটা আভূমি কুর্নিশ করে বললে, কান্দাহার থেকে এই ছুকরিকে নিয়ে এসেছি খোদাবন্দ্! এ একেবারে অক্ষত—

সেলিম রক্তরাঙা চোখ দুটো মেলে শুধু বললে, বোর্‌খা খুলে দে—

খিদ্‌মৎ-গারেরা আমার বোর্‌খা খুলে দিল। আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সেলিম লোকটাকে বললে, 'তুই যা এখন। কাল সকালে আসিস্। তুই যা বলেছিস্ তা যদি সত্য হয়, কাল ঠিকমতো ইনাম পাবি। যা ভাগ্।'

লোকটা সট্‌কে পড়ল। সেলিম টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে এল আমার দিকে—

মাঝপথেই মীনা থেমে গেল। আমি কিছুতেই বলতে পারলুম না: তারপর?

দুজনেই নির্বাক। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মীনাবহিন উপসংহার টানল তার কাহিনীর—আমিনার চেয়ে রক্তক্ষরণ আমার কম হয়নি সেরাত্রে। তফাৎ এই, আমিনার হয়েছিল গর্দানা দিয়ে, আমার দুই উরু বেয়ে—

—থাক মীনা! তোর ও গল্প আমি সহ্য করতে পারছি না।

তবু থামল না সে। বললে, এই তের বছরে না'হোক একশ পুরুষের

বিছানায় শুয়েছি। পাঁচবার পেটে সন্তান এসেছে। তিনবার অকালে ঝরে গেছে। দু-দুবার সন্তান প্রসব করেছি আমি—

আমি অবাক হয়ে বলি, বল কি? কোথায় তারা?

ম্লান হাসল মীনা। বললে, আমি জানি না তারা আমার পুত্র, না কন্যা!

—সেকি! কেন জান না?

—কানুন নেই! সন্তান মায়ের দুধ খেতে পায় না, পাছে মায়ের সুরৎ বিগড়ে যায়। দুধ-পিলানেবালী ঔরৎ ওদের আছে যথেষ্ট!

—দুধ না হয় নাই খাওয়ালে: কিন্তু তোমার সন্তানরা কোথায়?

—লেড়কা হয়ে থাকলে তারা হয়েছে খোজা; কালে হবে খোজা-প্রহরী: আর লেড়কী জন্মে থাকলে তাদের খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করা হচ্ছে—ভবিষ্যৎ-কালের শাহ্‌জাদাদের গুড়িয়া-খেলার ইন্তাজাম!

অনেকক্ষণ আবার দুজনেই নিশ্চুপ। আমি তার হাতটা তুলে নিয়ে বলি, এতদিন ভাবতুম আমার চেয়ে দুঃখী আর কেউ নেই; কিন্তু—

—সে কথাই তো-বলছিলাম। পিতাজী একটা ফার্সী-বয়েৎ শোনাতেন। বয়েৎটা ভুলে গেছি, তার অর্থ—"যদি কখনো মনে হয় আল্লাতালা তোমার প্রতি অকরুণ হয়েছেন, তাহলে হয় মাথা উঁচুতে কর, নয় নিচুতে।"

—তার মানে?

—তার মানে, নিদারুণ দুঃখে যখন খোদাতালার মেহেরবাণীতে সন্দেহ জন্মাবে তখন হয় আশ্‌মানের দিকে তাকিয়ে দেখ—অনুভব করবে, ঐ লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রজগতের মালিকের কাছে তোমার দুঃখ কতটুকু! অথবা নিচের দিকে নজর দিও—দেখ্‌বে তোমার চেয়েও হতভাগ্য আছে এ দুনিয়ায়।

আমি বলি, বিশ্বাস হয় না! আমার চেয়ে তুমি দুঃখী, নিঃসন্দেহে। কিন্তু তোমার চেয়েও দুঃখী কেউ আছে? থাকতে পারে?

—আছে! এই আগ্রা কিল্লাতেই। শুন্‌বি তার কথা? তার নিজ মুখে?

আমি দু-হাতে কান ঢেকে বলেছিলুম, না, না, না!

1613 খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মাটি নিলেন সালিমা-বেগম। তিনি ছিলেন আকবরের দ্বিতীয়া মহিষী। হুমায়ুনভ্রাতা কামরানের শ্যালক আবদাল্লা খান মুঘল-এর কন্যা। আকবরী-জমানায় তিনিই ছিলেন হারেমের নেতৃস্থানীয়া। আকবরের দেহান্ত হলেও জাহাঙ্গীর সালিমা-বেগমকে তাঁর ঐ পদ থেকে সরায়নি। নূরজাহা ইতিপূর্বেই হয়েছে পাটরানী—সালিমা-বেগমের দেহান্তে তার পদোন্নতি

হল—হারেমের সর্বময়ী কর্ত্রী।

তার বছর দুই পরে মুঘলবাহিনী দখল করল মেবার। অমরসিংহ সম্রাটের সঙ্গে বাধ্যতামূলক সন্ধি করলেন। মেবার জয়ের কৃতিত্ব বর্তালো খুররমের উপর। প্রথম অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন পরভেজ—অবশ্য খাতা-কলমে। আসল সৈন্যাপত্য ছিল আসফ খাঁ জাফর বেগ-এর। সেবার মুঘলবাহিনী মেবার জয় করতে পারেনি। দ্বিতীয় ব্যর্থ অভিযানের নেতৃত্ব ছিল সেনাপতি মহাব্বৎ খাঁর। শেষ অভিযানে সাফল্যলাভ করল খুররম্।

ফলে দরবারে শাহ্‌জাদা খুররমের খাতির গেল বেড়ে।

ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি। একই কাণ্ড হতে থাকে দাক্ষিণাত্যে। প্রথমেই মাথা নত করানোর প্রয়োজন আহ্‌মেদনগরের। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে দুটি রাজবংশের উত্থান ইতিহাসে দাগ ফেলেছিল—একটি মুসলমান রাজ্য: বাহ্‌মনী, দ্বিতীয়টি হিন্দুরাজ্য: বিজয়নগর। কালে এক বাহ্‌মনীরাজ্য ভেঙেই এতদিনে হয়েছে পাঁচটি ছোট ছোট রাজ্য—আহ্‌মেদনগর, বিদর, বেরার, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা। এর মধ্যে আহ্‌মেদনগরের শক্তিই সবচেয়ে বেশি। সে আমলে সেখানে তক্ত্-আসীন বীরকেশরী মালিক অম্বর। আবিসিনীয় ক্রীতদাস—অতি তীক্ষ্ণধী এবং পরাক্রমশালী। বাদশাহ্‌ হওয়ার পরে জাহাঙ্গীর পর পর অনেকগুলি অভিযান পাঠিয়েছে। প্রথমে আবদুর রহিম খান-ই-খানানকে; পরে শাহ্‌জাদা পারভেজ ও আসফ খাঁকে। কিন্তু কোনই সুরাহা হল না। অবশেষে জাহাঙ্গীর বাধ্য হয়ে শরণ নিল তাঁর অজেয় তৃতীয় পুত্র: শাহ্‌জাদা খুররমের। খুররম্ স্বীকৃত হল। কিন্তু একটি শর্তে—

বলব সে-কথা।

কিন্তু তার পূর্বে আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটা খণ্ড কাহিনী আপনাদের শোনাই। যে বছর ঔরঙ্গজেব জন্মালো (24.10.1618) সে বছর হল ভারত-ব্যাপী 'ব্যুবনিক প্লেগ'। জাহাঙ্গীর তখন ঐ মহামারি থেকে আত্মরক্ষার জন্য কিছুদিনের জন্য (1619) আগ্রা-কিল্লা ত্যাগ করে ফতেপুর-সিক্রিতে সপরিবারে আশ্রয় নেন। বস্তুত তিনি তখন গুজরাট থেকে আগ্রায় ফিরছিলেন—রাজধানীতে না ফিরে এসে উঠ্‌লেন ফতেপুর-সিক্রিতে। সেখানেই জাহাঙ্গীর খুররম্‌কে দাক্ষিণাত্যে সেনাপতি করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; আর তাকে খুশী করার জন্য জন্মদিনে তাকে সোনা-রূপো-হীরে-জহরৎ দিয়ে ওজন করান[১০]। তার পরেই এসে গেল নওরোজ-উৎসব—বসন্তকালে।

সারা ফতেপুর-সিক্রিতে তখন উৎসবের আমেজ। শুধু একটি ঘরে নেমে

এসেছে চরমতম বিষণ্ণতার ছায়া। শাহ্‌জাদা খস্‌রৌ তখন ফতেপুর-সিক্রিতে; কিন্তু তাঁর পূর্ণগর্ভা সহধর্মিণীকে প্লেগের ভয়াবহতা সত্ত্বেও আগ্রা কিল্‌লা থেকে অপসারিত করা যায়নি। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলুম সংবাদের জন্য। অবশেষে সংবাদ এল। খস্‌রৌর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে—সুস্থ সবল; কিন্তু গর্ভিণী মারা গেছেন।

স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে বাদশাহ্‌-মহলে বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। সন্তান হতে গিয়ে স্ত্রীলোক তো মরবেই; আর একটা সাদি করলেই তো লেঠা চুকে যায়! কিন্তু শাহ্‌জাদা খস্‌রৌর বুকে ঐ সংবাদটা যে কী নিদারুণ শেলের মতো বাজ্‌বে, তা বুঝতে আমার বাকি ছিল না। আজি-আম্মাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। সমস্ত প্রাসাদে সেদিন খুররমের জন্মদিনের আনন্দ উৎসব। শুধু চুপ করে একা বসে আছেন খস্‌রৌ। দাওয়ার বক্স তার মাকে ছেড়ে আসতে রাজী হয়নি। সে নাকি আগ্রায়।

আজি-আম্মা আমাকে পৌঁছে দিয়ে বাহিরে অপেক্ষা করে। আমি ধীর পায়ে ওঁর কাছে এগিয়ে যাই। বসি, পায়ের কাছে। পায়ের উপর একটা হাত রাখতেই বলেন, কে?

—আমি। লাডলী!

—ওঃ! খবরটা শুনেছ?

—জী হাঁ। তাই তো ছুটে এসেছি।

শাহ্‌জাদা অনেকক্ষণ নিশ্চুপ বসে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

"দ্বানিশ্‌ হামেশা জহৎ-শাদবাদ।
আজ আলম্‌ খোরাদাস আবাদ বাদ॥"*

জিজ্ঞাসা করি, দাওয়ার বক্স কখন আসবে?

—ওর আম্মাজানকে কবরস্থ করেই বোধহয়।

আবার দুজন চুপচাপ। শাহ্‌জাদা হঠাৎ আমার হাতটা টেনে নিয়ে বললেন, একটা কথা লাডলী-বহিন! কথাটা এখন আলোচনার সময় নয়; কিন্তু বাধ্য হয়ে আমাকে এখনই জেনে নিতে হচ্ছে। কারণ এর উপরেই নির্ভর করছে আমার পরবর্তী কর্মসূচী। বাদশাহ্‌ দু-চার দিনের মধ্যেই আগ্রায় ফিরে যাবেন। তার পূর্বেই আমার আর্জিটা পেশ করতে চাই।

* লোকান্তরিত জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যাক। সব মালিন্য দহন করে তাঁর আশীর্বাদে দ্যুলোক প্রজ্জ্বলতর হয়ে উঠুক।

—কিসের আর্জি ?

—বলছি। তার আগে একটা কথা বলি: দাওয়ারের মা বিদায়কালে আমার হাতদুটি ধরে একটা আখেরি আর্জি পেশ করেছে—সে নাকি তোমাকেও কথাটা জানিয়েছে ; বলেছে যে, যদি প্রসবকালে তার মৃত্যু হয়—

আমি ওঁর মুখ চেপে ধরি।

উনি ধীরে ধীরে আমার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলেন, কথাটা আমাকে শেষ করতে দাও লাডলী-বহিন। তাহলে তুমি জানো, কী ছিল তার আখেরি আর্জি—

অস্ফুটে বলি, জী হাঁ।

—তুমি তাকে তখন কী বলেছিলে ?

—আমি কিছুই বলিনি তাঁকে।

একটু ভেবে নিয়ে বলেন, ও! তাহলে আমাকে এখন কী বলবে ?

—আগে আপনি বলুন, বাদশাহ্‌র কাছে আপনি কী আর্জি পেশ করতে চান ?

—আমি বেগমের কাছে জবান দিয়েছি। তুমি আমাকে মুক্তি না দিলে আমার তো মুক্তি নেই। কিন্তু তুমি যদি আমার ছুটি মঞ্জুর কর, তাহলে তোমার জিম্বায় ঐ মা-হারা দুটি বাচ্চাকে সমর্পণ করে আমি মক্কা-সরিফ যাত্রা করতে চাই। মনে হয় বাদশাহ্‌ আপত্তি করবেন না। তুমি কি এ কাজ অনুমোদন কর?

আমার দু-চোখ নেমেছে জলের ধারা। বললুম, শাহ্‌জাদা, আজ আমি আপনার কাছে অন্তর উজাড় করে দেব। আপনাকে আমি প্রথম দিন থেকেই সে-চোখে দেখিনি। ছয়-বছর বয়সে আব্বাজানকে হারিয়েছি। আপনার ভিতর আমি আবার তাঁকে ফিরে পেয়েছি। তিনি আপনার মত পণ্ডিত ছিলেন না ; কিন্তু তিনিও ছিলেন আপনার মতো হৃদয়বান পুরুষ—পুরুষসিংহ! দাওয়ার বক্স আর তার ভাইয়ের দায়-দায়িত্ব আমি মাথা পেতে নিচ্ছি, শাহ্‌জাদা ? আপনি শুধু আশীর্বাদ করুন, আমি যেন সে দায়িত্ব পালন করবার উপযুক্ত হতে পারি। আপনি মক্কা-সরিফে যাত্রা করুন!

শাহ্‌জাদা আমার মাথায় একটি হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, সংসার থেকে মনে মনে নিষ্কৃত পেয়েছি ; কিন্তু তুমি ছুটি না দিলে তো ছুটি পেতে পারি না আমি। তুমি আমাকে বাঁচালে লাডলি-বহিন!

—আমারও একটি আখেরি-আর্জি আছে, শাহ্‌জাদা।

—বল, লাড্‌লি-বহিন!

—আপনি আমাকে 'লাডলি-বহিন' বলে ডাকবেন না!

—তাহলে? কী বলে ডাকব ?

—যে নামে আব্বাজান আমাকে ডাকতেন : মুন্না !

শাহ্‌জাদা দু-হাতে আমার মুখখানা ধরে টেনে নিলেন তাঁর কবাটবক্ষে। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলতে থাকেন, তুনে মেরে জান দি, মেরি মুন্না !

যে-কথা বলতে বলতে নিজের কথায় মত্ত হয়েছিলুম এবার ইতিহাসের সেই কথাটা বলি। জাহাঙ্গীর তাঁর পেয়ারের শাহ্‌জাদাকে সোনা-রূপা দিয়ে ওজন করলেন, নূরজাহাঁ তাঁর প্রিয়পাত্রকে উপহার দিলেন চুনিপাথর বসানো একটি তরবারি। কিন্তু জাহাঙ্গীর-নূরজাহাঁর যৌথ আবেদনে খুররম্ জানালো যে, দাক্ষিণাত্যে অভিযানে যেতে সে প্রস্তুত, কিন্তু একটি ছোট্ট শর্ত আছে—

—শর্ত ! কী শর্ত ?

—আমি একা যাব না। আমার সঙ্গে যাবেন শাহ্‌জাদা খসরৌ !

—খসরৌ ! সে গিয়ে কী করবে ? সে তো তোমার বোঝা বাড়াবে শুধু।

খুররম্ জেদী ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জবাব দিল না।

—কী হল ? জবাব দাও ? খসরৌ তোমার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গিয়ে কী করবে ?

—কিছুই করবে না। তবু সে থাকবে আমার হেপাজতে। আমার চোখের সামনে !

—কিন্তু কেন ? কেন ? কেন ?

খুররম্ নীরব। নূরজাহাঁ তখন তাঁর পক্কবিম্বাধর এগিয়ে আনলেন শাহ্‌-য়েন-শাহ্'র কর্ণমূলে। অস্ফুটে বললেন, অনুমতি দাও। উপায় নেই !

—ও আচ্ছা। বেশ তাই হবে।

জাহাঙ্গীর বুঝেছিল কিনা জানি না, প্রকাশ্যে স্বীকার করেনি ; কিন্তু তামাম হিন্দুস্তান বুঝেছিল। স্ত্রৈণ জাহাঙ্গীর তার জ্যেষ্ঠপুত্রকে তুলে দিল ঘাতকের হাতে। অন্দর-মহলে বয়ে গেল চাপা কান্নার রোল। প্রকাশ্যে কাঁদবে এমন হিম্মৎ নেই কারো। এই সহজ-সরল কথাটা বুঝতে পারেনি শুধু একজন বুড়বক : শাহ্‌জাদা খসরৌ।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা আমি গিয়েছিলুম খসরৌর মহলে। সেদিন সারা ফতেপুর-সিক্রি বিষণ্ণ, শুধু শাহ্‌জাদা খসরৌ দিলখুশ। আমি এসেছি বুঝতে পেরেই আনন্দে আমার হাতটা টেনে নিয়ে বলেন, খবর শুনেছ মুন্নি ? আল্লাহ্‌র অসীম কৃপা।

—এটাকে আল্লাহ্‌র অসীম কৃপা বলছেন আপনি ? খুররমের এই আজব-আর্জিটাকে ?

—না, না, না। সে-কথা নয়। খবর পাওনি? দাওয়ার বক্স ফিরে এসেছে। কাল ভুল খবর পেয়েছি আমরা। বেগমসাহেবা শুধু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল; আবার তার জ্ঞান ফিরে এসেছে। ওরা দুজনেই ভাল আছে!

এটা একটা খবরের মতো খবর বটে! শাহ্‌জাদার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্পগুজব হল। তিনি সদ্যোজাতের নাম দিয়েছেন 'গুর্সাস্প'। শেষ পর্যন্ত আমরা ফিরে আসি খুররমের আজ্ঞিব আর্জিটার প্রসঙ্গে। উনি বললেন, আপাতত মক্কা-তীর্থে যাবার পরিকল্পনা বাদ দিয়েছেন। বেগম-সাহেবা এবং সদ্যোজাতকে দেখবার—অর্থাৎ তাঁর নিজের পদ্ধতিতে 'দেখবার' ইচ্ছাটা প্রবল। কিন্তু খুররম্ রাজী নয়। সে অবিলম্বে বুর্‌হানপুর কিল্লা অভিমুখে রওনা হতে চায়—দাক্ষিণাত্য বিজয়ে। আবদুর-রহিম খান-ই-খানান যা পারেননি, পারেনি শাহ্‌জাদা পারভেজ অথবা আসফ খাঁ, সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে চলেছে শাহ্‌জাদা খুররম্—আহমদ-নগরের সেই ক্রীতদাস-নবাবকে পুনরায় ক্রীতদাস করতে। বিরাট বাহিনী প্রস্তুত—অগণিত পদাতিক, অশ্বারোহী, রণহস্তীর বাহিনী, কামান, গোলা-বারুদের শকট।

খস্‌রৌ বললেন, তোমরা সবাই ভুল বুঝেছ। খুররম্ ছেলে ভাল; আমাকে খুবই শ্রদ্ধা করে। ওর আশঙ্কা হয়েছে—সে যখন সুদূর দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধরত তখন যদি বাদশাহ্‌র ভালোমন্দ কিছু হয়, তখন রাজধানীর আমীর মালিকেরা আমাকে গদীতে বসিয়ে দিতে পারে। অনেক প্রতিপত্তিশালী আমীর-ওমরাহ্ আছেন, যাঁরা আমাকে খুব ভালোবাসেন। তাঁরা আমার দৃষ্টিহীনতার কথাটাকে পাত্তাই দিতে চান না। বলেন, 'রাজা কর্ণেন পশ্যতি'; অর্থাৎ কি না শাসক মন্ত্রীসভার পরামর্শ মতো, চর, সংবাদবহ এবং বিশ্বস্তজনের বার্তা শুনে ফর-মান জারী করেন। এজন্যই খুররম্ চেয়েছে আমি যেন তার চোখের সামনে থাকি।

আমার সেদিনই শুধু মনে হয়েছিল: খস্‌রৌ অন্ধ! উত্তপ্ত লৌহ-শলাকায় তাঁর চোখের মণি বিদ্ধ হয়েছিল বলে নয়; তিনি অন্ধ—ভ্রাতৃস্নেহে, সরল অসন্দিগ্ধ হৃদয়ের উদারতায়।

তর্ক করলে অন্ধ চক্ষুষ্মান হয় না। তাই, তর্ক করিনি। বরং প্রসঙ্গান্তরে চলে আসি। জানতে চাই, শাহ্‌জাদা! আপনি আল্লাহ্‌র নিষ্ঠুরতায় কখনো অভিমানক্ষুব্ধ হননি?

হাসলেন উনি। একটু ভেবে বললেন, অভিমান করেছি। তবে তাঁর নিষ্ঠুরতার জন্য নয়। তাঁর মেহেরবানির জন্য!

—মেহেরবানির জন্য? কী মেহেরবানি?

—সাতটা দিন আগে কেন তিনি আমাকে অন্ধত্বের অভিশাপ দিলেন না!

—সাতটা দিন! কোন্ সাতটা দিন?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ওঁর। হাতটা আমার মাথায় রেখে বললেন, আজ নয়, মুন্নি! আজ আনন্দের দিনে সে সব দুঃখের কথা আমাকে বল্‌তে বলিস্ না!

আনন্দময় মানুষটার কাছ থেকে সেই দুঃখের কথা আর আমার কোনদিন শোনা হয়নি। হবে কি করে? সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। পরদিনই পাল্কিতে চেপে খস্‌রৌ রওনা হয়ে পড়লেন বিপুল মুঘল-বাহিনীর সঙ্গে। তিনি যে বন্দী, এ বোধ তার নেই। অন্তরে যিনি আনন্দময় তাকে কি বন্দী করা যায়?

—'আমারে বাঁধবি তোরা, সেই বাঁধন কি তোদের আছে?'

শাহজাদা খস্‌রৌ দাক্ষিণাত্য-বিজয়ী মুঘল-বাহিনীর সঙ্গে রাজধানীতে ফিরে আসেননি আদৌ।

তবে সেই সাতদিনের ইতিহাসটা শুনেছিলুম। আজি-আম্মার কাছে। খস্‌রৌর মৃত্যুসংবাদ যেদিন এল সেদিনও মুঘল-হারেম মুখ লুকিয়ে চাপা কান্নায় গুমরে গুমরে উঠেছিল। মুঘল-বাহিনীর জয় হয়েছে, প্রকাশ্যে কাঁদবে এমন হিম্মৎ কার? আর খস্‌রৌ তো মারা গেছেন নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে—তীব্র অম্লশূলের ব্যথায়! হাকিম-সাহেব নাকি তাই বলেছেন, বুরহন্‌পুর কিল্‌লা থেকে সংবাদসহ সেই খবরই নিয়ে এসেছে—শাহ্‌জাদা খুররমের স্বহস্ত লিখিত পত্র, শাহ্‌য়েন-শাহর নামে।

আর ঠিক ঐ কথায় লেখা আছে: 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'-তে।

অর্থাৎ, ইমান-ইন্‌সাফের মালিক তামাম হিন্দুস্থানের ভাগ্যবিধাতা নূরউদ্দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌ গাজীর তুর্কীভাষায় লেখা আত্মজীবনীতে।

অর্থাৎ ইতিহাসে।

আমরা—আজি-আম্মা, মীনাবহিন আর আমি তখন থাকতুম বাঁদী মহলে। সে প্রাসাদটা বর্তমানে নেই। শাহ্‌জাহাঁ সেই আকবরী-স্থাপত্য ভূমিসাৎ করে বানিয়েছেন কিছু হাল-ফ্যাসানের নয়া-মোকাম। কোথায় জানেন? মীনা-মস্‌জিদের উত্তরে। আগ্রা-কিল্‌লায় গেছেন কখনও? অমরসিংহ দরওয়াজার পুবে—এখন গাইডরা যাকে বলে আকবরী মহল, সে আমলে সেটাতেই বাস করতেন জাহাঙ্গীর, স-নূরজাহাঁ। তার উত্তরে, এখন যার নাম জাহাঙ্গীরী-মহল, সেখানে অবস্থান করতেন নূরজাহাঁর উপেক্ষিতা সতীনরা—রাজা মানসিংহের ভগ্নী মানবাঈ, শাহ্‌জাহাঁ-জননী মানমতী এবং অন্যান্য পত্নী, উপপত্নীর দল। তার উত্তরে পর-পর খাশ্‌ মহল, শীশ্‌ মহল, হামাম আর মীনা মস্‌জিদ। তারও উত্তরে আমাদের ঐ প্রাসাদ। এক-এক ঘরে এক-এক শাহ্‌জাদার উপপত্নীদের

আবাস, ঝড়তি-পড়তি হারেম-রমণীদের আস্তানা। ওখানেই দ্বিতলের একটি কামরা নির্দিষ্ট হয়েছিল আমাদের তিনজনের জন্য।

শাহ্‌জাদা খসরৌর তিরোধান-সংবাদে মনে হল আমার দ্বিতীয়বার পিতৃ-বিয়োগ হল বুঝি।

ওরা দুজনও বিষণ্ণ, বিষাদগ্রস্ত। শাহ্‌জাদা খস্‌রৌর বিষয়েই নানা কথাবার্তা হচ্ছে। কথাপ্রসঙ্গে আমি বলি, শাহ্‌জাদা আমাকে একদিন বলেছিলেন—অন্ধ করে দিয়েছেন বলে আল্লাতালার বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিমান ছিল না; বরং তাঁর অভিমান ছিল—কেন তিনি সাতদিন আগে তাঁকে অন্ধ করে দেননি!

মীনাবহিন বলে, তাঁর মানে? সাতদিন আগে অন্ধ হলে তাঁর কী লাভ হত?

জবাব দিল আজি-আম্মা। বললে, তোরা তখনো জন্মাসনি, অথবা নিতান্ত শিশু। তাই তোরা জানিস না। আমি জানি। বলি শোন। তবে সবটা বুঝতে হলে আরও আগে থেকে শুরু করতে হবে। জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে খস্‌রৌর বিদ্রোহ নয়, শাহ্‌-য়েন-শাহ আকবরের বিরুদ্ধে সেলিমের বিদ্রোহ থেকে এ কিস্‌সা শুরু হওয়া উচিত। শোন—

আজি-আম্মার কাছে শোনা ইতিহাসের সেই কটা পাতা আবার সাজিয়ে দিই—

আকবর-বাদশাহ্‌-র শেষজীবনে সেলিম বিদ্রোহ করেছিল। সে তখন এলাহাবাদ কিল্লায়। হঠাৎ সেখান থেকে বেমক্কা ঘোষণা করে বলল—আকবর জীবিত থাকা সত্ত্বেও, সেলিমই হচ্ছে হিন্দুস্তানের বাদশাহ্‌। আকবরের বিরুদ্ধে সেলিমের এই খোকা-বিদ্রোহের কারণটি গুরুতর: আকবর বড় বেশিদিন বেঁচে আছেন!

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই। সোরাব মোদীর বিখ্যাত ছায়াছবি—'মুঘল-এ-আজম' থেকে পাঠককে প্রভাবমুক্ত করার জন্য পুনরুক্তি দোষ হওয়া সত্ত্বেও আবার বলি—সেলিমের এই বিদ্রোদের সঙ্গে তার পহেলী-প্যার 'আনারকলি' অথবা শের আফকন-ঘরণী মেহের-উন্নিসার কোন সম্পর্ক নেই। ইতিহাস বলছে—এ শুধু আশু সিংহাসন লাভের মোহ! বছর পঁয়ত্রিশ বয়স হয়ে গেল—তবু আজও যুবরাজ! বুড়োটা আর কতদিন বাঁচতে চায়।

আকবর ছিলেন স্থিতধী। পুত্রের অবিমৃষ্যকারিতায় সংযম হারালেন না। সেলিমের এক বিশ্বস্ত ইয়ারদোস্ত্‌ খাজা মহম্মদ সরিফকে এলাহাবাদ কিল্লায় পাঠিয়ে দিলেন। পুত্রকে লিখলেন, কেন এসব কাণ্ড করছ? এ মসনদ্‌ তো তোমারই জন্য। এস। আগ্রায় চলে এস—ধীরে ধীরে দায়দায়িত্ব বুঝে নাও।

তাতে ফল হল না কিছু। খাজা সরিফ এলাহাবাদ কিল্লায় সেলিমের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র যুবরাজ বলে ওঠে, এই যে তুমি এসে পড়েছ! তোমাকেই এ্যদ্দিন খুঁজছিলাম যে!

খাজা সরিফ অবাক হয়ে বলে, আমাকে খুঁজছিলে? কেন?

—বাঃ, আমি তক্ত-তাউসে উঠে বসলে তুমিই তো হবে আমার উজীর-এ-আজম।

খাজা সরিফ একটা ঢোক গিল্‌ল। সম্রাটের পত্রটা সে জেব থেকে আদৌ বার করল না।

আকবর সে সংবাদ পেয়ে বুঝলেন, এ কোন ছেলে-ছোকরার কাজ নয়। কাকে পাঠাবেন? মানসিংহের মতো জঙ্গী মানুষকে দিয়ে এ জাতীয় কাজ হবে না—হয়তো রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যাবে। চাই ধীর স্থির বিচক্ষণ কোনও সভাসদ। যাঁর পাণ্ডিত্যকে অন্তত শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হবে সেলিম, যতই বিদ্রোহী বেপরোয়া হোক সে। মনে পড়ল তাঁর নবরত্নের মধ্যমণি সেই কৌস্তুভ-টির কথা: সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক আবুল ফজল-এর কথা।

কিন্তু আবুল ফজল তখন রাজধানীতে নেই। আছেন দাক্ষিণাত্যে তৎ-ক্ষণাৎ দ্রুতগামী অশ্বারোহী-সংবাদবহ ছুটল দাক্ষিণাত্যে। সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র প্রভুভক্ত আবুল ফজল রওনা দিলেন আগ্রার দিকে। দুর্ভাগ্য তাঁর এবং ভারতে-ইতিহাসের, আগ্রাতে তিনি পৌছাতে পারেননি।

সেলিমের খোকাবিদ্রোহের এইটেই সবচেয়ে বড় অপকীর্তি। আবুল ফজলকে সম্রাট তলব করেছেন খবর পেয়ে সেলিম তাঁর গুপ্তহত্যার আয়োজন করল। ঘাতক জানত—সেলিম বীভৎস-রসের কারবারী। তাই খুন করেই ক্ষান্ত হল না। ইতিহাস বলছে, বুন্দেলা সর্দার—ঘাতকটার নাম উহ্যই থাক্ না, আবুল ফজলের কর্তিত মুণ্ডটা ভেট পাঠিয়ে দিয়েছিল সেলিমের কাছে!

তানসেনের মৃত্যুতে শেষ হয়েছিল আকবরী-ললিতকলার একটি বিশেষ অধ্যায়—সেটা স্বাভাবিক অবসান; আবুল ফজলের হত্যায় সিংহাসন লাভের পূর্বেই সেলিম স্বহস্তে টেনে নিল আর একটি কৃষ্ণ-যবনিকা: ইতিহাস-চর্চা।

মুঘল গৌরবরবি পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছেন!

দুরন্ত ক্রোধে জলে উঠলেন আকবর। হুকুম দিলেন, সৈন্য সাজাও! আমি স্বয়ং যাব এলাহাবাদ।

"সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন অতিবৃদ্ধা মরিয়াম মকানী—আকবরে গর্ভধারিণী জননী। পুত্রের হাত দুটি ধরে বললেন, বেটা উস্‌কো মাফি কিয়া যায়। আমি

তার হয়ে মার্জনা চাইছি।

"অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আকবর। শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বললেন, তুমিই আমাকে মাফ কর, আম্মাজান! তা হয় না।

"বিস্মিতা হামিদাবানু বলেন, আমার কথা রাখবি না? আমি ··আমি না তোকে দশমাস গর্ভেধারণ করেছি?

"আকবর বললেন, মা! সেলিম হিন্দুস্থানের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এখানে আমি কারও পিতা নই, যেমন নই কারও পুত্রও!

"অতিবৃদ্ধা বানু-বেগমের মনে হল—তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান ঐ বৃদ্ধটা সম্পূর্ণ অপরিচিত। অস্ফুটে বলেন, কারও পিতা নয়, কারও পুত্র নয়, তবে তুই কী?

"হক্-হকিকতের জিঞ্জিরবদ্ধ অন্ধ-বধির এক নফর!

"ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে গেল আকবর-জননীর মুঠি।

"বাদশাহী ফৌজ রওনা দিল স্থলপথে। আকবর যাত্রা করলেন ময়ূরপঙ্খি বজরায়। যমুনাবক্ষে। সেলিমের কিস্‌মৎ সরিফ্—চড়ায় আটকে গেল বজরা। হাতি দিয়ে তাকে টেনে জলে নামাতে না নামাতে নামল প্রচণ্ড বর্ষা। তিন দিন চলল অক্লান্ত বর্ষণ। মাঝি মাল্লারা বজরা চালাতে সাহস পেল না—দিগ্‌দিগন্ত দেখা যায় না কিছুই। ইতিমধ্যে আগ্রা-কিল্লা থেকে ছুটে এল কর্দমাক্ত এক অশ্বারোহী সংবাদসহ। দুঃসংবাদ এনেছে সে—আকবর-জননী নাকি মৃত্যুশয্যায়। শেষ-দেখা দেখতে চান পুত্রকে। আকবর প্রথমটা বিশ্বাস করেননি। ভেবেছিলেন, তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার এ বুঝি এক হারেমি-ফিকির। কিন্তু পত্রলেখিকা স্বয়ং গুলবদন বেগম! আকবরের পিসী, হুমায়ুনের ভগ্নী—প্রখ্যাতা কবি, যিনি 'হুমায়ুননামা' রচনা করে ইতিহাসে অমর। অশীতিপরা ধার্মিক মহিলা মিছে কথা লিখবার মানুষ নন।

"আকবর ফিরে এলেন আগ্রায়।

"তার ক'দিন পরেই হামিদাবানু বেগমের মরদেহ নীত হল আগ্রা থেকে দিল্লীতে, হুমায়ুন-সমাধিতে তাঁর সন্দোখ্-চিহ্নিত কবরের নিচে শুইয়ে দেওয়া হল তাঁকে।

"আকবরের মাতৃভক্তি আদর্শস্থানীয়। তামাম জিন্দেগীতে মাত্র দুবার তিনি মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করেছিলেন বলে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর জীবনীকার। একটির কথা এইমাত্র বলেছি, সেটি লিখে যাবার ফুসরৎ পাননি 'আকবরনামা'র লেখক আবুল ফজল; কারণ তাঁর মৃত্যুই ছিল সেই ঘটনার মূলে। সে তথ্যটি অন্যসূত্র থেকে সংকলিত। কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনাটি আবুল ফজল সবিস্তারে লিখে গেছেন—

"সেবার আগ্রা-কিল্লায় সংবাদ এল পর্তুগীজ বোম্বেটের দল নাকি পবিত্র কুরান গ্রন্থটিকে একটি কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দমন-শহরের পথে পথে দেখিয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন হামিদাবানু বেগম। এর প্রতিশোধ চাই। পুত্রকে আদেশ করলেন, একটি গাধার গলায় একখণ্ড বাইবেল গ্রন্থ লট্‌কিয়ে দিয়ে আগ্রা-শহরে কৌতুকযাত্রার আয়োজন করতে। সম্মত হতে পারেননি অক্ষরপরিচয়হীন জালাল্‌উদ্দীন আকবর। বলেছিলেন, মা, আমি জেনেছি, বাইবেল একটি মহান গ্রন্থ। কতকগুলো অশিক্ষিত অর্বাচীন পর্তুগীজ বোম্বেটের অবিমৃষ্যকারিতার অপরাধে আমি তো সেই পবিত্র গ্রন্থকে অপমান করতে পারিনা।

"সে যাই হোক, নিতান্ত ঘটনাচক্রে—যেন প্রাণ দিয়ে, বানুবেগম সেবার জান বাঁচালেন তাঁর নাতির।

"পিতামহীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সেলিম নিজেই চলে এল আগ্রায়। প্রকাশ্য দরবারে—দেওয়ান-ই-আমের অলিন্দে সিংহাসন-আসীন বাদশাহর চরণপ্রান্তে প্রণত হয়ে ক্ষমাভিক্ষা প্রার্থী হল। অসাধারণ সংযম আকবর বাদশাহ্‌র। সর্বসমক্ষে কোন রকম উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ হল না। হাজার হোক, ঐ অপদার্থ পুত্রকেই তো বসিয়ে দিয়ে যেতে হবে হিন্দুস্থানের তক্ত-তাউসে! মুরাদ ও দানিয়েল—আকবরের অপর দুই পুত্র, তার পূর্বেই মারা গেছে—অতিরিক্ত মদ্যপান ও অসংযমী জীবন যাপন করায়।

"অন্তপুরে এসে আকবর আচমকা ছেলের কাঁধ ধরে ঘুরে দাঁড়ালেন। পিতাপুত্র দুজনে মুখোমুখি। একেবারে আচমকা তেষট্টি বছর বয়সী আকবর তাঁর ছত্রিশ বছর বয়সী ছেলের গালে কষিয়ে দিলেন যাকে বলে: একটি বাদশাহী থাপ্পড়। উল্টে পড়ে গেল সেলিম, শাহ্‌ন-বাঁধানো পাথরে!

"কাঁধের কাছে খামচে ধরে আবার দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন, মনে থাকবে?

"সেলিম ততক্ষণে বাকশক্তি হারিয়েছে।

"হিড় হিড় করে ওকে টেনে নিয়ে গেলেন গোসলখানায়। একজন হাকিম, একজন নাপিত আর একজন খিদ্‌মদগারের জিম্বায় ঐ ঘরে আবদ্ধ করলেন যুবরাজকে। বিশ্বস্ত প্রহরীকে ডেকে বললেন, দশ দিন কারাগার! এর মধ্যে কারও সঙ্গে যেন দেখাসাক্ষাৎ করতে না পারে। খেতে চাইলে খেতে দিও—লেকিন্ হোঁসিয়ার! এই দেউরীর ভিতর এক ফোঁটা মদ অথবা এক দানা আফিং ঢুকেছে খবর পেলে তোমাদের তিনজনকেই হাতির পায়ের তলায় পিষে ফেলব।"[11]

এই হচ্ছে শাহ্-য়েন-শাহ্ আকবরের বিরুদ্ধে সেলিমের খোকা-বিদ্রোহের ইতিহাস। এবার তুলনা করতে হবে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে শাহ্জাদা খস্রৌর বিদ্রোহ। হিন্দুস্থানের সিংহাসনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল না খস্রৌয়ের; কিন্তু আকবরের শেষজীবনে যাঁরা ছিলেন প্রতিপত্তিশালী আমীর ওমরাহ, তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন মহামতি আকবরের একাধিক গুণ বর্তেছে এক-জমানা ডিঙিয়ে খস্রৌর চরিত্রে। অথচ সেলিম উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপ, ইন্দ্রিয়াসক্ত। আবুল ফজলের হত্যাতে সেই অসন্তোষ উঠল তুঙ্গে। তাঁরা সচেষ্ট হলেন—আকবর বাদশাহ্র প্রয়াণে সরাসরি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে হবে তাঁর নীতি খস্রৌকে। শাহ্জাদা খস্রৌও সম্মত হলেন।

যুদ্ধটা হয়েছিল ভৈরোয়াল বলে একস্থানে। জাহাঙ্গীরের পক্ষে সমগ্র মুঘল বাহিনী তার যুবরাজ খস্রৌর স্বপক্ষে মাত্র দশ হাজার সৈন্য। যারা খস্রৌকে ভালবাসতো এবং আকবরের দেহান্তে একজন উদারচেতা বাদশাহ্কে সিংহাসনে আসীন করতে চেয়েছিল। খস্রৌব বিপক্ষে যেটা সবচেয়ে কার্যকরী হয়েছিল, আমার মনে হয়, সেটা হচ্ছে আকবব বাদশাহ্র অন্তিম বাসনা। সেলিমকেই তিনি উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে গেছিলেন, খস্রৌকে নয়।

খস্রৌর পরাজয় ঘটল। কাবুলের পথে পলায়নপর খস্রৌকে বন্দী করে নিয়ে আসা হল সম্রাটের সকাশে। জাহাঙ্গীর সম্রাটোচিত গাম্ভীর্যে এক দরবার ডাকলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ তিনজন বন্দীকে উপস্থিত করা হল। শাহ্জাদা খস্রৌ এবং তার দুই সেনাপতি আবদুর ও হুসেন বেগ। ধর্ষকামী জাহাঙ্গীর দুই সেনাপতির যে শাস্তির বিধান করেছিলেন তা বীভৎসতার এক অনতিক্রম্য উদাহরণ!

"একটা মৃত ষাঁড়ের গোটা চামড়া খুলে নিয়ে তার মধ্যে হুসেম বেগকে জোর করে ঢুকিয়ে চারদিক বেশ শক্ত করে সেলাই দেওয়া হল। আবদুরকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল একটি গাধার খোলসের মধ্যে। তারপর ওদের উঠিয়ে দেওয়া হল দুটো গাধার পিঠে…। সেই অবস্থায় শোভাযাত্রা করে দুজনকে লাহোরের রাস্তায় ঘোরানো হল।"[12]

বন্দী খস্রৌকে বসিয়ে রাখা হল একটি অলিন্দে। যাতে তিনি এই শোভাযাত্রা স্বচক্ষে দেখতে পান। চারিদিকে সেলাই করা মৃত জন্তুর কাঁচা চামড়ার মধ্যে যখন দুটি হতভাগ্য শেষ নিঃশ্বাসের আশায় পূতিগন্ধময় দূষিত বাতাস নিয়ে ধড়ফড় করছে তখন অনুগামী ঢোলক বাদকেরা তালে তালে বাজনা বাজাচ্ছে। প্রায় বারো ঘণ্টা পরে হুসেন বেগের ধড়ফড়ানি শান্ত হল। মৃত জন্তুর খোলসের ভিতর বাতাসের অভাবে মৃত্যু হল তার।

আমীর ওমরাহ্‌রা সম্রাটকে অনুরোধ করেছিলেন, শাহ্‌জাদা খস্‌রৌকে প্রাণে বধ না করতে। হাজার হোক বাদশাহ্‌জাদা সে। শুধু ওর চোখ দুটি উত্তপ্ত লৌহশলাকায় বিদ্ধ করে দিতে—কারণ শরিয়তী কানুনে অন্ধমানুষ মসনদের হক্‌দার হতে পারে না। পরম করুণাময় জাহাঙ্গীর সম্মত হলেন পুত্রের জীবনদানে। অনুমোদন করলেন পুত্রকে অন্ধ করে দেবার শাস্তিটা। শুধু বললেন, দু-একদিন পরে। দৃষ্টিশক্তি খোয়াবার আগে শাহ্‌জাদা তার দৃষ্টিশক্তির শেষ আনন্দ উপভোগ করে নিক।

"এর দিনকতক পরে সম্রাটের আদেশে একটি দীর্ঘ রাস্তার দুপাশে সাতশ শূল পুঁতে দেওয়া হল। তাতে বিদ্ধ করা হল খসরুর সাতশ' বিদ্রোহী অনুচরকে। মরণাতীত যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বিদ্রোহীরা সেদিন শুধু মরণকেই ডেকেছিল—মরণ, একটু তাড়াতাড়ি।···তাইতো মজাটা কেমন হয় দেখবার জন্য জাহাঙ্গীর হুকুম দিলেন, খসরুকে হাতির পিঠে চাপিয়ে সেই রক্তমাখা রাস্তায় একটু বেড়িয়ে আনার।"[13]

অন্ধ খস্‌রৌ তাঁর দৃষ্টিহীনতার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ হননি; কিন্তু তাঁর নাকি অভিমান ছিল—কেন খোদাতালা সাতটা দিন আগে অন্ধ হবার সুযোগ তাঁকে দেননি!

ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন আপনারা? আমি করি। আমার ক্ষেত্রে কথাটা বর্ণে বর্ণে ফলে গেছিল। আমাকে একনজর দেখেই এক জটাজুটধারী অশীতিপর সন্ন্যাসী বলেছিলেন, "হবে রে, তোর সাদি হবে। অনতিবিলম্বেই। রাজার নাতির সাথে। যা ভাগ্!"

রাজার নাতি! সে আবার কী? রাজার ছেলে নয় কেন? আর তাছাড়া রাজার নাতি কোথায় পাওয়া যায়? অম্বর, মারবার, যোধপুর থেকে বারে বারে রাজকুমারীরা মুঘল-হারেমে এসে ঢুকেছে; কিন্তু কই, কখনো তো শুনিনি কোন হিন্দু রাজপুত্র—না হয় রাজার নাতিই হল—পুরস্ত্রী করে নিয়ে গেছে কোনো মুসলমান্‌নাকে! তাহলে? অথচ রুস্তম বলেছিল, সন্ন্যাসী বাক্‌সিদ্ধ! মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে নাকি অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অথবা তাঁর শ্বশুরকে।

আমরা তখন সদলবলে চলেছি ফতেপুর-সিক্রি থেকে আগ্রায়। শাহ্‌জাদা খুররম্ সসৈন্য দাক্ষিণাত্যবিজয়ে রওনা হয়ে যাবার ক'দিন পরে। দূরত্ব এমন বেশি নয় যে, একদিনে পারাপার করা চলে না। কিন্তু তাহলে ব্যাপারটাতে মোঘলাই আড়ম্বরটা থাকে না। তাই আকবরী-জমানা থেকে এই প্রথাটা চলে আসছে। মাঝপথে বিরাট এলাকা জুড়ে পড়ে আছে একটা অস্থায়ী ছাউনি। আসলে এটাও একটা মোঘলাই উৎসব। আকবরী-আমলের শেষাশেষি ফতেপুর-সিক্রিতে জলাভাব দেখা দেয়। শহরের উত্তর-পশ্চিমে যে প্রকাণ্ড জলাশয়টা আছে, তা শুকিয়ে যেত। বাঁধ দিয়েও কিছু সুরাহা হল না। এজন্য আকবর-বাদশাহ্ কয়েক বছর শীতকালে থাকতেন ফতেপুর-সিক্রিতে, গ্রীষ্মকালে আগ্রায়। যমুনা তো আর শুকিয়ে যাবে না। দুই শহরে যাতায়াতের জন্য মাঝের ডাঙা জমিটায় বছরে দুবার মেলা বসে যেত। নাচনেওয়ালী, বান্দর-ভালুক নাচিয়ে, ভানুমতির খেল আর শত শত মেঠাই-মণ্ডার অস্থায়ী দোকান। হারেমের বাধ্যবাধকতা ঐ সময়ে কিছুটা শিথিল হত। মেলা-প্রাঙ্গণের বাহির দিয়ে যথারীতি খোজা প্রহরীদের দুর্ভেদ্য বেষ্টনী; কিন্তু মেলা-প্রাঙ্গণের ভিতরে হারেমের পর্দা কিছুটা শিথিল। মেয়েরা বোরখা পরে ইচ্ছামতো ঘোরাফেরা করতে পারে। পুরুষেরা মুখে এঁটে রাখে মুখোস। যাতে তাদের সনাক্ত করা না যায়! এমনকি শাহ্‌জাদারা পর্যন্ত এখানে মুখোসধারী। কে-কার হাত ধরে ঘুরছে মালুম হয় না। পূর্বসঙ্কেত অনুসারে অবশ্য প্রতিটি বোরখাধারিণী সমঝে নেয়, কে কার বাঞ্ছিত নাগর। কর্তৃপক্ষ বোঝেন সবই—কিন্তু হারেম-বাঁদীদের সাময়িক মুক্তি দিতে ব্যাপারটাকে আমল দিতেন না।

আমি চিরটাকালই একা। মীনাবহিন তার বাঞ্ছিত নাগরের সঙ্গে মেলা-প্রাঙ্গণের জনারণ্যে মিশে গেছে। আমি এক-একাই চলেছি ভানুমতীর খেল দেখতে। কী একটা অদ্ভুত দড়ির খেলা দেখায় নাকি লোকটা। সে বাঁশি বাজায়, আর তার ঝাঁপি থেকে মোটা পাকানো শনের দড়িটা সাপের মত হেল্‌তে দুল্‌তে মাথা তোলে। ধীরে ধীরে উঠে যায় আকাশপানে। উঠতে উঠতে এত উঁচুতে চলে যায় যে, আর নজর চলে না। মিশে যায় মেঘের মধ্যে। তারপর নাকি সেই মাদারী দড়ি বেয়ে উঠতে থাকে বেহেস্ত্‌-এর দিকে। কেউ বলে, যাদুকর নিজে ওঠে না, দড়ি বেয়ে উঠে যায় তার সঙ্গিনী। আর তারপর···

অবিশ্বাস্য গল্প! অথচ অনেক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছে আমাকে সবিস্তারে। তাই দেখতে বের হয়েছি। কোনদিকে যাদুকরের মণ্ডপ জানা নেই; বোরখার জালির ভিতর দিয়ে পথঘাট ভাল দেখাও যায় না। ক্লান্ত হয়ে ভীড়ের একান্তে দাঁড়িয়ে হাঁপচ্ছি, কে যেন কানের কাছে চুপি-চুপি ডাকল: মুন্নি।

চম্‌কে উঠি। ভীষণভাবে। 'মুন্নি' আমার ডাক-নাম নয়। শুধু বিশেষ একজন আমাকে এককালে ঐ নামে ডাকত। কিন্তু সে লোকটা তো শুয়ে আছে বহু দূরে; বর্ধমানের এক অখ্যাত কবরের তলায়। আরও একজনকে বলেছিলুম ঐ নামে আমাকে ডাকতে। কিন্তু সেই হতভাগ্যও তো শুয়ে আছেন হিন্দুস্থানের আর এক প্রান্তে, বুরহানপুর কিল্‌লার একান্তে একটি কবরের তলায়। তাহলে? আমি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকি। লোকটা সাহস করে আরও ঘনিয়ে এল; কানে কানে ডাকলে – লাড্‌লি!

ঘুরে দাঁড়াই। এক অপরিচিত পাট্টা নওজোয়ান। মাজায় ঝুলছে তলোয়ার মাথায় উষ্ণীষ। মুখে মুখোস। অস্ফুটে বলি, কে আপনি?

— রুস্তম! আমি রুস্তম-ভাই!

আমি বজ্রাহত। রুস্তম-ভাইকে শেষবার যখন দেখি—সেই বর্ধমান থেকে আগ্রা আসার পথে, তখন সে আট বছরের বালকমাত্র। তারপর এক যুগ অতিক্রান্ত—বারোটা বছর। অবাক হয়ে বলি, আপনি কেমন করে চিনলেন আমাকে?

—তোমার পরনে যে ফিরোজা-রঙের বোরখা, নিচে রূপালি জরির ফ্রিল। তোমার পায়ে যে লাল-ভেলভেটের নাগরা, তাতে সোনালী জরির নক্‌শা।

—তাতে কী প্রমাণ হয়?

—প্রমাণ হয়: তুমি সেই ছোট্ট লাড্‌লি-বেগম।

—কেমন করে?

—আমার মা, তোমার আজি-আম্মা আমাকে সঙ্কেতটুকু বাৎলে দিয়েছিল।

আমার বুকটা উত্তেজনায় ওঠানামা করছে। যেন লুকিয়ে প্রেম করছি। ভীষণ ইচ্ছে করছিল একটানে ওর মুখের মুখোসটাকে টেনে খুলে ফেলি। সেসব কিছুই করিনি। আবার জানতে চাই, কেন?

—কী 'কেন'? আম্মা কেন আমাকে ঐ সঙ্কেতটা বাৎলে দিয়েছিল? সহজ জবাব। আমার যে ভীষণ ইচ্ছে করছিল তোমাকে একবার দেখতে। তোমার করে না।

কি-জানি-কেন আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল তখন। বর্ধমানের হারানো দিনগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম চোখের উপর। সেই দিগন্ত বিস্তৃত শর্ষে-তিসির ক্ষেত, লেজঝোলা ফিঙের নাচন, স্তব্ধ-মধ্যাহ্নে ঘুঘুর ডাক! এই আমার শৈশবের খেলার সাথী! আমাকে সে কত আদর করেছে, সোহাগ জানিয়েছে আর আমি—জায়গীরদারের আদরের দুলালী—ওকে কত কিলিয়েছি—ঢিস ঢিস্ করে। কথাটি বলেনি!

জিজ্ঞাসা করে, কোনদিকে যাচ্ছিলে তুমি? চল, তোমাকে পৌঁছে দিই।

—যাচ্ছিলুম ভানুমতীর খেল্ দেখতে। কিন্তু এখন আর তা দেখার ইচ্ছা নেই। কোনও নির্জন জায়গায় আমাকে নিয়ে যেতে পার, যেখানে সেই আগেকার দিনের মতো···

কথাটা আমার শেষ হল না। রুস্তম আমার বাম মণিবন্ধ চেপে ধরল। বলল, এস।

আমার জানা ছিল না, অথবা হয়তো শুনেছি, ভুলে গেছি রুস্তম ইতিমধ্যে ফৌজে নাম লিখিয়েছে। তার কোনো বিশেষ দোস্ত্ যে-প্রান্তে পাহারা দিচ্ছে সেদিক দিয়ে বন্ধুকে সঙ্কেত করে সে অনায়াসে আমাকে বার করে আনল কঠোর প্রহরার বাহিরে। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে এলুম আমরা দুজন। মেলা-প্রাঙ্গণের কল-কোলাহল ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে। একটা নির্জন দীঘির ধারে, প্রকাণ্ড একটা পিপুলগাছের তলায় আমাকে বসিয়ে দিল সে। মুখ থেকে মুখোসটা খুলে ফেলে, পাগড়ি দিয়ে মুখটা মোছে। আমাকে বলে এখানে জনমনিষ্যি নেই। বোরখার ঢাকনা খুলে ফেলতে পার।

সম্পূর্ণ অপরিচিত বিশ বছরের এক নওজোয়ান! সরু গোঁফের রেখা। পুরন্ত দেহ। না! অপরিচিত হবে কেন? ঐ তো সেই চোখ-জোড়া, কপালে সেই জরুলের চিহ্ন, আর তার সেই নিজস্ব হাসি!

রুস্তমও অবাক বিস্ময়ে এতক্ষণ দেখছিল আমাকে। অনেকক্ষণ পরে সবার

প্রথম সে যে কথাটা বলেছিল তা লিখতে—এই বুড়ি বয়সেও—আমার সরম হচ্ছে ! কথাটা সে ভেবে চিন্তে বলেনি। আচমকা বলে ফেলেছিল :

—তুমি তোমার মায়ের চেয়েও সুন্দর !

জানি, জানি ! আপনাদের প্রতিবাদ করতে হবে না। মুখ টিপে বাঁকা হাসিটাও হাসতে হবে না। নূরজাহাঁর চেয়ে সুন্দরী যে সেদিন ভূ-ভারতে কেউ ছিল না, সে কথাটা আপনাদের চেয়ে ভালরকম জানা আছে আমার। কিন্তু 'সৌন্দর্য' জিনিসটা যে কী, তা কি কখনো খতিয়ে দেখেছেন ? তা কি শুধু ঐ দুধে-আলতা রঙ, ঘন ভুরু, পুরন্ত বুক আর ডমরুর মতো দেহাবয়ব ? না ! সেসব উপাদান সৌন্দর্যের আধখানা ; বাকি আধখানা থাকে দর্শকের মুগ্ধ হবার মানসিকতায়। রুস্তমের ঐ বেফাঁস বাক্যটা বাল্যবন্ধুকে বহুদিন পরে দেখতে পাওয়ার অহৈতুকী উল্লাসে—এটুকু আমিও সেদিন বুঝেছিলাম।

কথা ঘোরানোর জন্য তাড়াতাড়ি বলি, ঐ দেখ, এখানেও সেই রকম শাপলা ফুটেছে।

রুস্তম দীঘির দিকে একনজর দেখে নিয়ে হাসল। 'সেই রকম' বলতে কোন রকম তা জানতে চাইল না। ওর নিশ্চয় মনে পড়ে গেছে বর্ধমানের সেই বামুনমারি দীঘির পদ্মফুলের কথা। এক-ফোঁটা একটা বাচ্চা মেয়ের সখ মেটাতে একটা এক-ফোঁটা ছেলে সেদিন ডুবতে বসেছিল। ঐ দীঘি থেকে পদ্মফুল তুলতে গিয়ে। রুস্তম বললে, এখন আমি সাঁতার জানি। তুলে এনে দেব ?

—না। বরং পুরানো দিনের গল্প শোনাও। আচ্ছা রুস্তম, তোমার মনে আছে আব্বাজানের সেই বাঘ মারার গল্প ?

রুস্তম একটা চোরকাঁটা তুলে নিয়ে তার নিচের দিকটা চিবাতে চিবাতে বললে, আছে। সেই চিতোরের চিতা, আর আগ্রার ছোঁক-ছোঁক লোভী বাঘটা !

ও তাহলে ভোলেনি। প্রশ্ন করি, সাদি করেছ ?

বাহুল্যবোধে রুস্তম জবাব দিল না। সে সাদি করলে আমার তা না-জানা হতে পারে না। যেহেতু ওর মা হচ্ছে আমার অভিভাবিকা।

সামনের একটা তালগাছ দেখিয়ে বলে, ওগুলো কি ঝুলছে বল তো ?

—তুমি কি আমাকে বোকা মেয়ে পেয়েছ ? ওগুলো তো বাবুইয়ের বাসা।

—না, বোকা মেয়ে ভাবিনি। তবে কিল্লার ভিতরে থাক তো। তাই পরখ করে দেখছিলাম, জান কি না।

বলি, এদের কী কষ্ট নয় ? ঝড়ে জলে…

চোর কাঁটাটাকে দূরে ফেলে দিয়ে বললে, তুমি শুধু ওদের কষ্টটাকেই দেখলে! স্বাধীনতাটুকু নয়? তোমাদের হারেমে শুনেছি হরেক রকম চিড়িয়া আছে। তারা সোনার দাঁড়ে বসে, রূপার পাত্র থেকে দানা খায়। তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখ, তারা রাজি হবে কিনা ঝড়ে জলে এখানে এভাবে দোল খেতে! গাছের ডাল ভেঙে পড়ার দুর্ভাগ্যকে তারা স্বীকার করতে রাজি আছে কিনা।

আমি বলি, আমি কেন জিজ্ঞাসা করতে যাব? তুমিই জানতে চেও না?

রুস্তম আমার তীর্যক ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল না। বললে, আমি সেসব খানদানি চিড়িয়ার নাগাল পাব কি করে? তারা তো থাকে হারাম-সারাহ্‌র প্রহরার ভিতরে।

—কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, ঐ প্রহরার শিকলি কেটে কোন একদিন একটা চিড়িয়া চুপ্‌টি করে এসে বসবে তোমার পাশে, এক নাম-না-জানা গাঁয়ের একান্তে, পিপুল গাছের তলাটিতে।

রুস্তম আমার একটি হাত টেনে নিয়ে বললে, সে তো জন্ম থেকে 'বন্‌কি চিড়িয়া'—

হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল ওর। বললে, একটা জায়গায় যাবে লাডলী? প্রায় এসেই গেছি, আর আধ-ক্রোশটাক। ঐ বালিয়াড়ির ওপারে।

—কী আছে দেখবার?

—কাফেরদের একটা মন্দির। আর তার কাছাকাছি এক বিজন বনের ভিতর থাকেন এক ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসী ঠাকুর। বাংলা মুলুক থেকে তিনি তিব্বতে চলেছেন—মানস-সরোবরে। আপাতত দিন-সাতেক আছেন ঐ ভাঙা মন্দিরে। বিলকুল একা।

—তুমি কেমন করে জানলে?

সন্ন্যাসী আমাকে খুব প্যার করেন। আমি হররোজ ওঁর জন্যে মেওয়া-মিঠাই দিয়ে আসি। চল, ওঁকে তোমার হাতটা দেখাই। উনি নাকি গণনা করে অদ্ভুতভাবে ভবিষ্যতের কথা বলে দিতে পারেন। বাঙলাদেশের গড় মান্দারণের নাম শুনেছ?

আমি বাধা দিয়ে বলি, কী নাম সন্ন্যাসীর?

—অভিরাম স্বামী।

কৌতূহল প্রবল হল। বলি, কী জানতে চাইবে আমার বিষয়ে?

—তোমার সাদি কবে হবে। কার সাথে হবে।

আমি খিলখিল করে হেসে উঠি। বলি, তোমার এ অহেতুক কৌতূহল

কেন রুস্তম ?

রুস্তম জবাব দিল না। আমার হাতটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল।

অভিরামস্বামীকে দেখলে এখন চেনা যায় না। মানে, জগৎ সিংহ-দুর্গেশনন্দিনী দেখলে চিনতে পারতেন না। এই বিশ বছরে তাঁর যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। ষাট বছর থেকে আশী। জটাজুটধারী কৌপীনধারী সন্ন্যাসী। বসে আছেন একটি ব্যাঘ্র চর্মের উপর। সামনে ধুনি জলছে। পাশে মাটিতে পোঁতা আছে ত্রিশূল।

রুস্তমকে দেখে বললেন, আবার এসেছিস্! তোকে না বারণ করেছি সেদিন, মেওয়া-মিঠাই নিয়ে আসবি না ?

রুস্তম হেঁদুদের কায়দায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল সন্ন্যাসীকে। বললে, সেসব তো কিছু আনিনি বাবা। শুধু আমার এই বহিনকে নিয়ে এসেছি—

—কেন ? মতলবটা কী তোর ?

—আমরা বড় গরিব বাবা; ওর সাদি দিতে পারছি না। যদি ওর হাতের রেখা দেখে বলে দেন, ওর আদৌ সাদি হবে কিনা, তাহলে…

সন্ন্যাসী স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছিলেন। হঠাৎ বলে ওঠেন, পিতৃহন্তার হাতে বন্দিনী হয়ে আছিস্, এ্যাঁ ? কিন্তু তুই তো বিমলা নোস্! সে-ভাবে শোধ নিতে পারবি না!

মনে হল লোকটা পাগল। 'বিমলা' কে ? নামই শুনিনি কোনদিন। আবার বলে, বদনসিব তোর। কী করবি বল ? তবে, হবে! সাদি হবে তোর! অচিরেই। রাজার নাতির সাথে! যা ভাগ্!

আবার ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন।

ফেরার পথে ঐ নিয়েই কথা হচ্ছিল রুস্তমের সঙ্গে। আমি বলি, 'রাজার নাতি' বললেন কেন উনি ? কোন হিন্দুরাজার নাতি কখনো মুসলমাননীকে নিজের ঘরের বধূ করে নিয়ে যায় ?

রুস্তম বলে, অভিরামস্বামী বাকসিদ্ধ! তাঁর কথা ফলবেই।

—কেমন করে ? আমি তো কোন সমাধানই দেখতে পাচ্ছি না।

—আমি কিন্তু পাচ্ছি লাড্‌লী! 'রাজার নাতি!'

—কী সমাধান ?

—আজ নয়। আর একদিন বলব।

ফেরার পথে কথায় কথায় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ি দুজন। ও জানায় ওর সৈনিক জীবনের কথা। ইতিমধ্যে একবার দাক্ষিণাত্যও ঘুরে এসেছে। মৃত্যুর

মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে অনেকবার। সম্মুখযুদ্ধে। জানতে চায়, আমার হারেম-জীবনের কথা। বলে, মোটামুটি অবশ্য সবই শুনেছি আম্মাজানের কাছে। শুধু একটা কথা জানি না—

—কী?

—জিজ্ঞাসা করব? কিছু মনে করবে না তো, মুন্নি?

—না, রুস্তম! এ দুনিয়ায় আব্বি-আম্মা আর মীনাবহিন ছাড়া একমাত্র তুমিই আমার বন্ধু, যদিও তোমার-আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় না, হওয়া সম্ভবপর নয়।

তবু ইতস্তত করে বললে, তোমাকে কি ওরা…মানে, শাহ্-য়েন-শাহ্ তোমাকে রেহাই দেবেন, যেহেতু তোমার মায়ের সঙ্গে…আমি ভাবছি শাহ্জাদাদের কথা! তারা কি…

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। পূর্বমুহূর্তেই সূর্যাস্ত হয়েছে। চরাচর জনমানবশূন্য। শুধু বহু দূর থেকে কোন হিন্দুগ্রামের কুলবধূর ক্ষীণ শঙ্খধ্বনি ভেসে আসছে। হেসে বলি, না! তোমার আশঙ্কা অমূলক রুস্তম! এই বিশ বছরেও আমি জানি না, পুরুষ মানুষে মুখে চুমু খেলে দেহে কী জাতের শিহরণ হয়!

বিশ্বাস করুন, আল্লাহ্‌র নামে শপথ নিয়ে বলছি—অমন একটা বিশ্রি কাণ্ড ও করে বসতে পারে এ-কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ বুঝতে পারি, ঐ নির্জন পরিবেশে অমন একটা মারাত্মক প্রলোভন দেখানো অন্যায় হয়েছিল আমার। সে নিজেও অপ্রস্তুতের একশেষ! রুস্তমও ভাবতে পারেনি - এই সামান্য ব্যাপারে আমার অমন একটা প্রতিক্রিয়া হবে। বললে, মাফি কিয়া যায়!

পাগল কাঁহাকা! তোমাকে মাফ্ করব কী জন্য? বিশবছরে এই অভিজ্ঞতা প্রথম উপহার দিলে বলে? কিন্তু মুখ ফুটে সে বলতে পারলুম কই?

বছর-দেড়েক পরের কথা।

নূরজাহাঁ-ইতমদ্‌উদ্দৌলা-আসফ আলি-খুররম্ চতুর্ভুজ জোটটা ভেঙে গেছে। মদ্যপ, অহিফেনসেবী, নিষ্ঠুর,—বলা যায় ধর্ষকামী এক শিখণ্ডীকে খাড়া করে ঐ চারজন কূটবুদ্ধির মানুষ এতদিন হিন্দুস্তানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। খুররম্‌ই ছিল বাকি তিনজনের 'ডার্ক হর্স'। এ ঘোড়া নিশ্চিত জিতবে—অন্তত ঐ তিনজনের যৌথ মদৎ পেলে। আর ওদের তিনজনের দৃঢ় বিশ্বাস খুররম্‌কে শিখণ্ডীরূপে সাজিয়ে জীবনের বাকি কটা দিন ধনদৌলতের পাহাড় বানাতে পারবেন। সেটাই তো জীবনের পরমার্থ! অতুলনীয় অর্থ আর অপরিসীম ক্ষমতা। অপব্যয়ের আধিক্যে যে ধনসম্পদ নিঃশেষিত হয় না। অপশাসনে যে প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে কেউ কোনদিন প্রতিবাদ করতে পারবে না। আর কি চাই দুনিয়ার?

জাহাঙ্গীর বাদ্‌শাহও জিন্দেগীভর খুশ্‌! তক্ত-তাউসে উঠে বসেই তিনি নানান খান্‌দানি নীতিবাক্য ঘোষণা করেছেন সম্রাটোচিত মর্যাদায়—রাজ্যের কোথাও কোন অনাচার বিলকুল না-মঞ্জুর! প্রজাদের সম্পত্তির নিরাপত্তায় কেউ হাত দিতে পারবে না! কোন অপরাধীকে অঙ্গহানি করে শাস্তি দেওয়া চলবে না। সবচেয়ে আজব ঘোষণা: রাজ্যে কোথাও মদ বা কোন জাতের মাদক দ্রব্য কেনা-বেচা করা চল্‌বে না।

শুধু ঘোষণাই নয়, আগ্রা দুর্গের কাছাকাছি একটা স্তম্ভ থেকে যমুনা-নদীতক্‌ তিনি টাঙিয়ে দিয়েছিলেন প্রকাণ্ড একটা সোনার শিক্‌লি! কী একটা জব্বর ফার্সি নামও তার ছিল। স্যার টমাস্‌ রো ইংরাজিতে তার অনুবাদ করেছিলেন: The Chain of Justice! আমরা বাংলায় বল্‌তে পারি: 'সুশাসন-শৃঙ্খল'। সেই শৃঙ্খলে দু-দশটা নয়, গোনা গুণ্‌তি ষাটটা ঘণ্টা। বাদ্‌শাহ সারা আগ্রা শহরে ঢেঁড়া ঘোষণা করলেন—যে-কোন প্রজা ঐ ঘণ্টা বাজিয়ে নির্ভয়ে সম্রাটের কাছে অভিযোগ জানিয়ে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করতে পারে। এভাবেই সুশাসনকে শৃঙ্খলিত করা হয়েছিল!

ঘণ্টা কিন্তু কোনদিনই বাজেনি। আর ঘণ্টা যখন বাজেনি তখন জাহাঙ্গীর বাদ্‌শাহ নিশ্চিন্ত ছিলেন—তাঁর প্রতিটি আদেশ নিশ্চয় পালিত হচ্ছে! মদ আফিং বিক্রি হচ্ছে না। প্রজারা শান্তিতে আছে। আর না থাকবে কেন? নূরজাহাঁ স্বয়ংই তো সব দেখ ভাল করছে!

এমনই হয়। অত্যাচরিত যখন প্রতিবাদের ভাষাটাও হারিয়ে ফেলে তখন শাসক আত্মতুষ্টিতে প্রসন্ন হয়। চিরটাকাল। শুনেছি এখনো হিন্দুস্তানে তাই হয়। গদিতে উঠে বসেই নয়া-শাসক 'আম-দরবারে'র আয়োজন করে। কয় মাস? ক্রমে নয়া-শাসক বুঝতে পারে আমলাতন্ত্রের হাতে দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে জীবনের ঐ দ্বৈত পরমার্থের জন্য মনোনিবেশ করাই শ্রেয়। অর্থ আর ক্ষমতা। সে আমলে সঞ্চয়ের মেয়াদ ছিল সিংহাসনে আরোহণ থেকে পুত্রের হাতে শাসনদণ্ড হস্তান্তরিত করা—সময়টা দীর্ঘ। ধীরে-সুস্থে সঞ্চয়টা করা চল্‌ত। ইদানীং শুনেছি ঐ আখের-গুছানোর মেয়াদটা এক ভোটযুদ্ধ থেকে আর এক ভোটযুদ্ধ! সময়টা স্বল্প। তাই যা করার তা একটু তাড়াতাড়ি করতে হয়। সে জন্যই হয়তো কিছুটা দৃষ্টিকটু মনে হয়। এ ছাড়া তফাৎ কোথায়?

জাহাঙ্গীরের কথায় ফিরে আসি। সে নিশ্চিন্ত ছিল—ইতিহাসে তার নাম সুশাসক হিসাবে লিখিত থাকবে। তার অনুমান সত্য। ইতিহাসে শুধু লেখা আছে, 1605 খ্রীঃ আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন

এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের হিতার্থে দ্বাদশ ঘোষণাপত্র (দস্তুর-উল্-আমল) জারি করেন। তাদের বিনা কষ্টে ন্যায় বিচারের সুবিধা লাভের জন্য যমুনা তীরে একটি প্রস্তর-স্তম্ভ থেকে সম্রাটের দরবার গৃহ পর্যন্ত টানা একটি শিকলে ষাটটি ঘণ্টা বেঁধে দেন। যে কোন প্রজা এই ঘণ্টা বাজিয়ে তার অভিযোগ সম্রাটের কাছে পেশ করতে পারত।"[14]

এইটুকুই তো হওয়া উচিত ঐতিহাসিকের পরিবেশিত তথ্য! ঘণ্টা কখনও বেজেছিল কি বাজেনি সেটা তো তুচ্ছ কথা!

আমার জ্ঞান মতে 'চেইন অব জাস্টিসে'র ঘণ্টা জাহাঙ্গীর জমানায় মাত্র দুবার বেজেছিল। দুবারই তা নিয়ে রীতিমতো তদন্ত হয়েছিল, এখন যাকে বলা হয়: 'জুডিশিয়াল এন্‌কোয়ারি।' প্রথমবার তদন্তে জানা যায়—মাঠে চরা একটা গাধা সোনার বলে আকৃষ্ট হয়ে নাকি ঐ ঘণ্টাটাকে খেতে যায়। ঘণ্টা দুলে ওঠে। হুড়মুড় করে সবাই ছুটে আসে সে ঘণ্টাধ্বনি শুনে। শোনা যায়—ন্যায়াধীশ জাহাঙ্গীর বাদ্‌শাহ এ নিয়ে রীতিমতো তদন্ত করেছিলেন। গাধার মালিক ভর্ৎসিত হয়েছিল—সে নিশ্চয় গর্দভটিকে ভাল করে খেতে দেয় না। না হলে গাধাটা সোনার ঘণ্টা খেতে যাবে কেন? একেই বলে ন্যায়বিচার!

দ্বিতীয়বার অবশ্য ঘণ্টাটা বেজেছিল একটা বাচ্চা ছেলের দুষ্টামিতে। জাহাঙ্গীর তাকে ডেকে ভর্ৎসনা করেননি। ছেলেমানুষ ভুল করে ঘণ্টা বাজিয়ে ফেলেছে—ওটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কে যেন বল্‌লে বাচ্চাটা খানদানী ঘরের—বস্তুত বাদ্‌শাহ পরিবারের। কৌতূহল হয়েছিল সম্রাটের। জানতে চাইলেন—'কৌন সে লৌণ্ডা?' উজীরে-আজম তদন্ত করে সম্রাটকে জানালেন—ও কিছু নয়, আপনারই নাতি—দাওয়ার বক্স। ওর আব্বাজান বুরহানপুর কিল্লায় অম্লশূলের ব্যথায় মারা গেছেন শুনে ছোকরার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অসীম দয়ালু বাদশাহ্‌ রীতিমতো দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'আহা ওকে তোমরা কিছু বল না। শুধু আব্বাজান নয়, ওর মা-ও যে মনের দুঃখে ফৌত হল একই সঙ্গে।

তা বটে! বুরহানপুর থেকে দুঃসংবাদ আসার সাতদিনের ভিতরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দাওয়ার বক্স আর গুর্শাস্প-এর জননী। হাকিম-সাহেব এবার কী বলেছিলেন—অম্লশূলের ব্যথা না আত্মহত্যা—সেটা ইতিহাসে লেখা নেই।

ওসব তুচ্ছ কথা থাক। ইতিহাসের কিস্‌সা শোনাই:

চতুঃশক্তি গোষ্ঠীর তিনজনই আস্থা রেখেছিলেন শাহ্‌জাদা খুররমের উপর। তিনজনই তার নিকট আত্মীয়—শ্বশুর, দাদাশ্বশুর আর পিশ্‌শাশুড়ী! তাঁদের

আশা জাহাঙ্গীর ফৌত হলে এ ছেলেই সন্তানের উপযুক্ত কাজ করবে। প্রথমেই বানাবে বাপের জন্য এক বিশাল মক্‌বারা আর তারপর ত্রয়ী-শক্তির নির্দেশে হিন্দুস্তান শাসন করতে থাকবে। বাধাগুলি সে তো নিজে হাতেই একে একে অপসারিত করছে। খস্‌রৌ খসেছেন, পরভেজ যে-হারে মদ্যপান করছে তাতে সে হয়তো বাপের আগেই ফৌত হবে। আর জড়ভরত শাহ্‌রিয়ার তো খুররমের ছোট! একটা পঙ্গু পনের বছরের কিশোর—এতদিনে একটা সাদিই করতে পারল না। সে তো হিসাবের বাইরে।

কিন্তু চতুঃশক্তির চক্রান্তটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল খুররমের উপর্যুপরি সাফল্যে। মেবারের পর দাক্ষিণাত্য, সেখানেও খুররম্‌ বিজয়ী। শাহ্‌জাদা খুররম্‌ সসৈন্য প্রত্যাবর্তন করল আগ্রাতে। আকস্মিক 'অম্লশূলের ব্যথা'য় খস্‌রৌ মারা গেছে বুরহানপুরে। তাকে কবর দিয়ে এসেছে সাড়ম্বরে। পারভেজ অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত কারণে প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী। খুররমের সম্মুখে আর কোন বাধা নেই। ইতমদ্‌উদ্দৌলা আর নূরজাহাঁর মদৎ ছাড়াই সে তক্ত্‌ হাউসে উঠে বসবে জাহাঙ্গীর ফৌত হওয়া মাত্র! এই সময়েই পারস্যরাজ থাবলা বসালেন উত্তরখণ্ডে। নখদন্তহীন জাহাঙ্গীরের তখন একমাত্র ভরসা শাহ্‌জাদা খুররম্‌। তাকেই অনুরোধ করলেন—হ্যাঁ, এতদিনে আর 'আদেশ' নয়, অনুরোধ—পারস্যরাজের বিরুদ্ধে রণযাত্রা করতে।

এই ব্রাহ্মমুহূর্তে খুররম্‌ তার মুখোশটা খুলে ফেলল। নিজ মূর্তি ধারণ করল অকুতোভয়ে। নূরজাহাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি—তৎক্ষণাৎ সমঝে নিল—এই খুররমকে মসনদে বসিয়ে পিছন থেকে কলকাঠি নাড়াবার ক্ষমতা তার নেই! যে-কটা দিন জাহাঙ্গীর টিকে আছে সেই কটা দিনই নূরজাহাঁর জমানা। নানান পারি-তোষিকে তুষ্ট করতে চাইল খুররম্‌কে; কিন্তু ভবি ভুলল না।

নূরজাহাঁ তখন কোনঠাসা বাঘিনী। মরিয়া হয়ে উঠ্‌ল সে। একটা শিখণ্ডী তার চাই-ই। পারভেজ আর জাহান্দার তাদের বাপের মতই উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপ, নেশাগ্রস্ত এবং আনুসঙ্গিক দোষদুষ্ট। তাদের শরীর এত দ্রুতহারে ভেঙে পড়েছে যে, সন্দেহ হয়—বাপের আগেই তারা হয়তো ফৌত হবে।

হঠাৎ একটা চমৎকার বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়! কী আশ্চর্য! এমন সহজ সমাধানটা তো তার নজরে পড়েনি এতদিন! শিখণ্ডী তো আছেই:

শাহজাদা শাহ্‌রিয়ার!

ষোল বছরের বালক। জড়ভরত। বাঁ-হাতটা পঙ্গু। আজ পর্যন্ত তার সাদির কোনও প্রস্তাবই আসেনি। সাদি করার যোগ্যতাই যে নাই তার!

কথায় জড়তা আছে ; মুখ দিয়ে ক্রমাগত লালা ঝরে। তবে বাঁচবে হয় তো অনেকদিন। মদ-টদ খায় না তো!

ঐ শাহ্‌রিয়ারকেই জামাই করতে হবে। তেইশ বছরের লাডলীটাতো আজও অনূঢ়া!

বিশ্বাস করুন—প্রথমটা আমার প্রত্যয় হয়নি। নূরজাহাঁর ক্ষমতালিপ্সা আকাশচুম্বী—জানি, জানি তা! তাই বলে, তার একমাত্র কন্যাকে সে বলি দেবে এভাবে? হারেমের কোন্‌ উপেক্ষিত একান্তে তার তেইশ বছরের মেয়েটা পড়ে আছে তা হয় তো নূরজাহাঁর খেয়াল নেই—কিন্তু তাকে তো দশমাস গর্ভে করেছিল!

কথাটা প্রথম বলেছিল আজি আম্মা। আমার বিশ্বাস হয়নি। তারপর মীনাবহিনও একদিন এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে: তোর এতবড় সর্বনাশ হবে, এ আমরা কেউ যে কোনদিন কল্পনাই করতে পারিনি!

—তাহলে খবরটা সত্যি?

—হরগিজ্‌! সবাই তো জানে! বাদশাহ্‌ পর্যন্ত সম্মতি দিয়েছেন নূরজাহাঁর প্রস্তাবে।

তেইশ বছরের অরক্ষণীয়া সেদিন সন্ধ্যায় হাজির হয়েছিল ছয়চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়া—না, তরুণীর মঞ্জিলে। সরাসরি কৈফিয়ৎ তলব করেছিল মায়ের কাছে

নূরজাহাঁ বললে, এছাড়া আর কোন উপায় নেই রে, মুন্নি!

—'মুন্নি'! না, তুমি আমাকে 'লাডলী' বলে ডাকবে।

—বেশ, না হয় তাই ডাকব। কিন্তু ভেবে দেখ্‌, এছাড়া খুররম্‌কে কিছুতেই রোখা যাবে না!

—কিন্তু তাকে যে রুখতেই হবে তার মানেটা কী? তুমি নিজেও তো প্রায় পঞ্চাশের কোঠায় পৌঁছে গেছ! এবার ধর্মকর্ম কর না একটু?

নূরজাহাঁ তার স্বভাবসিদ্ধ ভুবনভোলানো হাসি হেসে বললে, আমাকে দেখ্‌লে কি মনে হয়—পঞ্চাশের কোঠায় পা দিতে চলেছি?

—এটা আমার কথার জবাব নয়। আর যার কাছেই লুকাও, আমার তো সেটা জানতে বাকি নেই!

—আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ্‌, লাডলী·

—না! জীবনভোর আমিই তোমার দিকে তাকিয়ে আছি! আজ একটিবার মাত্র তুমি আমার দিকে তাকিয়ে দেখ? কী দিয়েছ তুমি আমাকে? শাহ্‌জাদা আমার চেয়ে সাত বছরের ছোট—ছোট ভাইয়ের মত। সে পঙ্গু!

তার সন্তান হবে না কোন দিন—

—কে বললে ?

—আমি বলছি ! মীনা বহিন তার ঘরে বহু রাত কাটিয়েছে।

—বোকা মেয়ে ! তুই তো ওকে শুধু আনুষ্ঠানিক সাদি করবি। তোর দেহের চাহিদা তোর শখ-আহ্লাদ তোর সন্তান—সব—সব ইন্তেজাম করে দেব আমি।

সেই মুহূর্তটিতে আমার উপলব্ধি হল—কী জাতের প্ররোচনায় আব্বাজান প্রহরীবেষ্টিত কুৎবউদ্দীন কোকাকে আক্রমণ করেছিল। সেই খণ্ডমুহূর্তে আমার হাতে যদি একটা ছোরা থাকত তাহলে তা আমূল বিদ্ধ হয়ে যেত ভারতসম্রাজ্ঞীর বক্ষপঞ্জরে।

—কি ? তুই রাজী তো ?

আমি শুধু বলেছিলুম, তোমার সঙ্গে কথা বলতে ঘৃণা হয় আমার !

মুঘল-হারেমে অবশ্য কোনকালেই স্ত্রীলোকের সম্মতি নিয়ে বিবাহের আয়োজন হয় না। আমার ক্ষেত্রেই বা ব্যতিক্রম হবে কেন ? যথারীতি সাড়ম্বরে বিবাহের আয়োজন হতে থাকে ; আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম আজি আম্মার নিরাসক্ততায়। একদিন তাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কাঁদলুম। আজি আম্মা—তখন সে পঞ্চাশোর্ধ্বা বৃদ্ধা, একটাও সান্ত্বনার কথা বলল না। আমার চুলের মধ্যে নিঃশব্দে বিলি কাটতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

গভীর রাত্রে কে যেন আমাকে ঠেলা দিয়ে তুলে দিল। ঘুমটা ভেঙে যেতে দেখি—আজি আম্মা। আমাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেয়। বলে, রাত এখন তিন প্রহর। সমস্ত কিল্‌লা ঘুমাচ্ছে। তোকে কয়েকটা জরুরী কথা বলে নিই, মন দিয়ে শোন !

আমার ঘুম ততক্ষণে একেবারে ছুটে গেছে। পালঙ্ক থেকে নেমে পড়ি। আজি আম্মা প্রদীপটা নিবিয়ে দেয়। শুক্লা-সপ্তমীর ক্ষীণ আলো পশ্চিমাকাশে। আজি আম্মা বলে, তুই তো জানিস্ যে, আমি উদয়পুর থেকে মুঘল-হারেমে এসেছিলাম খুররমের মায়ের খাশ বাদি হিসাবে। জানিস্ তো ?

—হ্যাঁ, জানব না কেন ? তা সে-সব কথা এই মাঝরাত্রে কেন ?

—বলছি। শোন্। আমি জন্মসূত্রে হেঁদু। আমার বাবা ছিলেন উদয়পুরের এক ছোটখাটো জায়গীরদার। কিন্তু অত্যন্ত ধর্মাত্মা, ন্যায়পরায়ণ মানুষ ছিলেন তিনি, তাই তাঁর জায়গীরের বুড়োবাচ্চা সবাই তাঁকে ডাকত

'রাজা-মশাই' নামে ; বুঝলি ?

—না। তাতে কী হল ?

—কী বুড়বক রে তুই ! এখনো বুঝিসনি ? আমার বাপ যদি 'রাজা-মশাই' হয়, তাহলে আমার ছাওয়াল কী হল ? 'রাজার নাতি' নয় ?

বর্ধমানে আমাদের কিল্লার পুবধারে একটা কদমগাছ ছিল। আমার সারা দেহ সেই গাছের ফোটা-কদমের মতো রোমাঞ্চিত হয়ে গেল।

—এবার বুঝলি ? সন্ন্যাসীঠাকুর ঝুট বাৎ বলেনি। এই নে! পোশাক-গুলো পরে নে। রুস্তম্ তোর চেয়ে লম্বা, একটু ঢলঢলে হবে। তা হোক্ ! রাতে কারও ঠাওর হবে না !

সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা শুনে আমি বজ্রহত হয়ে গেলুম।

আজি আম্মা আর রুস্তম্ আমার উদ্ধারের জন্য একটা দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করেছে। পুরুষের পোশাকে মাজায় তলোয়ার বেঁধে—কিল্লা-প্রহরীর ছদ্মবেশে—আমি চলে যাব 'সামান বুর্জ'-এ। সেখানে গেলেই দেখতে পাব—পুবদিকে অর্থাৎ যমুনার দিকে কিল্লাকুঞ্জর থেকে একটা দড়িব সিঁড়ি নেমে গেছে যমুনা-কিনারে। আকাশে এখনও চাঁদ আছে ! রুস্তম নদীতীরে অপেক্ষা করবে। সে দেখতে পাবে, কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাব না—কারণ গাছের ছায়ায় সে লুকিয়ে অপেক্ষা করছে। আমাকে আবছা দেখতে পেলেই সে চকমকি ঠুকে আলোর সংকেত করবে। ঐ সংকেত পেলে আমি দড়ির মই বেয়ে নেমে যাব। ভয়ের কিছু নেই ; কারণ মইটা যাতে না দোলে তাই রুস্তম দুর্গের বাহির থেকে সেটা চেপে ধরে থাকবে। ব্যাস্। বাকি কাজটুকু সহজ। কারণ যমুনার ঘাটে বাঁধা আছে একখানা ছিপ্।

সবটা শুনে আমি বলি, কিছুতেই কিছু হবে না, আজি আম্মা। আমাকে না জানিয়ে কেন এতদূর অগ্রসর হলে তোমরা ? এত রাতে আমরা কতদূর যেতে পারি ? কাল সকালেই সবাই জানতে পারবে। ধরা পড়ে যাব নির্ঘাৎ !

—পড়বি না। যাতে না পড়িস্ সে ব্যবস্থাও করেছি।

—কী ব্যবস্থা ?

সব কথা তো এখনই বলতে পারব না, মুন্নি। তুই বিশ্বাস কর আমাকে। আমি···আমিই তো তোর মা। আমার বুকের দুধ খেয়েই তো তোরা দুজন···

আজি-আম্মাকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেলি।

বিশ্বাস হয়। আজি-আম্মা নিশ্চয় কিছু ব্যবস্থা করেছে। আমি যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি, এটা জানাজানি হতে দেবে না সে। পোশাক পাল্টিয়ে তাড়াতাড়ি

রুস্তমের চোস্ত্-শেরওয়ানি গায়ে চড়াই। আজ্জি-আম্মা শক্ত করে বুকে কাচুলিটা বেঁধে দেয়, জামা পরার আগে। ভারি ইচ্ছে করছিল, আয়নায় চেহারাটা একবার দেখি। কিন্তু আজ্জি-আম্মা সাহস পেল না। আলো জ্বালা চলবে না। বলি, যাই তাহলে ?

—'যাই' বলতে নেই রে। বল, 'আসি'।

তা বটে। আজ আর আজ্জি-আম্মা হারেম-বাঁদি নয়, রাজার মেয়ে !

কী খেয়াল হল, আমি হিন্দুদের কায়দায়—যে কায়দায় বর্ধমানে থাকতে অনেক প্রতিবেশিনীকে প্রণাম করতে দেখেছি—সেই ভঙ্গিতে···

আজ্জি-আম্মা আমার বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরল। চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে হিন্দুদের মতো চুম্বন করল। বলল, ফর্সা হয়ে আসছে। আর দেরি করিস না। খোদা হাফিজ ! দুর্গা-দুর্গা !

আমি মুসম্মান-বুর্জ-এ ওঠার ঘোরানো সিঁড়িটার দিকে রওনা দিই।

আমি বোধহয় কিছুটা উল্টো-পাল্টা বলছি। অনেকদিন হয়ে গেল তো ! এখন মনে হচ্ছে, শাহ্‌জাদা শারহিয়ারের সঙ্গে আমার সাদির সময় দাওয়ার বক্সের মা কিল্লাতেই ছিলেন। আমাদের বিবাহের সময় তাঁকে দেখেছি। অথচ যতদূর মনে পড়েছে খসরৌ ছিলেন না। বোধহয় তখনো তিনি বুরহানপুর দুর্গে বন্দী। বন্দী, কিন্তু জীবিত। কারণ তাঁর মৃত্যু-সংবাদ কিললায় পৌছানোর ঠিক পরেই তাঁর স্ত্রী মারা যান—তা সে যেভাবেই হোক।

ঠিক তাই। কারণ শাহ্‌জাদা খসরৌর হত্যা কাহিনী যখন শুনি তখন আমি বিবাহিত। ঘটনাটা আমাকে জানিয়েছিল মীনাবহিন। সে কোন সূত্রে শুনেছিল, তা মনে নেই। কিন্তু সবিস্তারে সে যখন এটা বলছিল তখন সেখানে আমার স্বামীও ছিলেন। একথা মনে আছে এজন্য যে, অমন একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুনেও তার কোন প্রতিক্রিয়া হতে দেখিনি। হয়তো তখন সে সবকথা ভালোমত বুঝতেই পারত না। জন্ম থেকেই জড়বুদ্ধি কি না।

যে রাত্রে খসরৌ খুন হল সে-রাত্রে খুনী ছিল অনেক দূরে !

বুরহানপুর কিললায় সম্পূর্ণ একা বন্দী হয়েছিলেন খসরৌ। শৃঙ্খলাবদ্ধ নন আদৌ। মাননীয় অতিথি যেন। শুধু ব্যবস্থা ছিল সতর্ক প্রহরার। মধ্যরাত্রে কে যেন এসে রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করল। ঘুম ভেঙে গেল শাহ্‌জাদার। প্রশ্ন করলেন, কে ?

—আমি শাহ্‌জাদা খুররমের কাছ থেকে আসছি। আপনার আর্জি মঞ্জুর করেছেন তিনি। আপনি স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে মিলিত হতে আগ্রা যাত্রা করতে

পারেন। সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে। দ্বার খুলুন।

ছোটভাই খুররমের প্রতি কৃতজ্ঞতায় খস্‌রৌর অন্ধ দুটি চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। হাৎড়ে হাৎড়ে অন্ধ মানুষটি এগিয়ে এসে খুলে দিলেন মেহ্‌রানখানার রুদ্ধ কবাট।

তৎক্ষণাৎ তাঁকে আক্রমণ করল আগন্তুক। লোকটা পেশাদারী খুনী ক্রীতদাস আলি রেজ্জা। দানবাকৃতি এক নিষ্ঠুর হত্যাকারী। মানুষ খুন করতে অস্ত্রের ব্যবহার করে না সে। রক্তারক্তির কোন ব্যাপার নয়! পেশীবহুল দুটি থাবা অতর্কিতে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরল শাহ্‌জাদার কণ্ঠনালী। নিরস্ত্র অন্ধ মানুষটা আত্মরক্ষা করার কোন সুযোগই পেল না। মিনিট তিনেকের মধ্যে হয়ে গেল শেষ। সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা খস্‌রৌ লুটিয়ে পড়লেন পাষাণ-চত্বরে। নাক দিয়ে দু-ফোটা রক্ত শুধু বার হয়ে এল। চরিত্রবান, বিজ্ঞ, সর্বজনস্নেহধন্য মহান খস্‌রৌ 'অম্লশূলে'র আক্রমণে প্রাণত্যাগ করলেন।

তার বছর তিনেক বাদে খুররম্ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। জাহাঙ্গীর বন্দী হয়; কিন্তু খুররম্ মসনদে বসে না। পিতাকে মুক্ত করে দেয়। ক্ষমতাটুকু শুধু রাখে নিজ দখলে। সম্রাট ঐ সময়ে তাঁর পেয়ারের বেগম নূরজাহাঁ সহ কাশ্মীর ভ্রমণে গেছিলেন। সঙ্গে ছিলাম আমরা দুজন; আমি আর সম্রাটের কনিষ্ঠপুত্র শাহ্‌রিয়ার।

এরপর যে-কথাটা বলব—জানি, তা আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না

আমি আমার স্বামীকে ভালবাসতে পেরেছিলুম। সে আমার ছোটভাইয়ের মতো ছিল। সাদির সময় তার বয়স ষোলো, আমার তেইশ। এ নিয়ে হারেম-মহলে কত কৌতুক, কত চাপা হাসি? সব অপমান, সব হাসি-মশ্‌করা নীরবে সহ্য করেছিলুম। মনে আছে, বিবাহ-বাসরে সর্বাঙ্গে হীরা-জহরতের প্লাবন বইয়ে উপস্থিত হয়েছিল আমার মামাতো দিদি—আর্জুবানু বেগম। সঙ্গে শাহ্‌জাদা খুররম্। দুজনে দুটি উপহার দিল নবদম্পতিকে। আর্জুবানু আমার হাতে তুলে দিল একটি মুক্তার মালা। খুররম্ বললে, লাড্‌লী-বিবি, তুমি ওটা নিজে হাতে ওর গলায় পরিয়ে দাও। আমরা নয়ন মেলে দেখি! জীব-বিশেষের গলায় মুক্তার মালাটা কেমন খোলতাই হয়!

বিয়ের কনে! আমি জবাব দিতে পারিনি। সখী-বাঁদিরা জোর করে আমার হাত টেনে নিয়ে আমার স্বামীর গলায় আমাকে দিয়েই মালাটা পরালো। খুররম তখন বার করল একটা ছোট ডুগডুগি। রূপার পাত মোড়া, সোনার কারুকার্য করা। বাঁদর নাচে যেমন ডুগডুগি বাজানো হয়। সশব্দে সেটা

বাজিয়ে ছোট ভাইকে বললে, লাগ্‌-লাগ্‌ বান্দর-ভাইয়া, থোড়াকুচ্‌ নাচতো দেখাও!

শাহ্‌রিয়ার ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে নির্বোধের মতো বসে থাকে। অর্থগ্রহণ হয় না তার। খুররম আমার কোলের উপর ডুগডুগিটা ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে কোথায় চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল, লাড্‌লী বিবি! আমার বড় আদরের ছোট ভাইটাকে একটু নাচ-টাচ শিখিও। আমরা দেখতে আসব।

আমার চোখে সেদিন জল ছিল না; আগুনও নয়। বিয়ের কনে! আমি ছিলুম পাথরের মূর্তির মতো। তবে নজর হয়েছিল—উপস্থিত কারও কারও চোখে জল আগুন দুইই ছিল। অশ্রুসজল হয়ে পড়েছিল মীনাবহিনের চোখ দুটি। আর আগুন ছুটছিল আমার তথাকথিত জননী নূরজাহাঁর দু·চোখে!

আমার নিরবচ্ছিন্ন ব্যর্থতার জীবনে একবিন্দু সাফল্য ঐ শাহজাদা শাহ্‌রিয়ার। ইতিহাসে লেখা নেই—ইতিহাস মূর্খ! এসব কথা সে লেখে না; কিন্তু মাত্র সাতটা বছর বিবাহিত জীবনে ঐ মানুষটার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছিল!

প্রথম রাত্রি মানে ফুলশয্যার রাতটার কথা আমি কোনদিন ভুলব না।

ওর বাঁ-হাতটা পঙ্গু! ডানহাতে রত্নপ্রদীপের আলোয় সে আমার মুখখানা দেখল। ঘুরে ফিরে। নানান দৃষ্টিকোণ থেকে। তারপর প্রদীপটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠল।

আমি তো স্তম্ভিত! আমি কি এতই কুরূপ? আমাকে ওর পছন্দ হল না! কী চায় ও?

কোনও সান্ত্বনা আমি দিইনি। পালঙ্কের বাজু ধরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলুম। রাতটা ছিল চাঁদনি। প্রদীপ নিবে গেলেও ঘরে আলো ছিল। জড়ভরত মানুষটার অশ্রুর উৎস শেষ হলে সে নিজেই উঠে বসল। আমার দিকে ফিরে শুধু বললে, জানবার! জানবার!

কী বলতে চাইছে? অস্ফুটে জানতে চাই, কে জানোয়ার?

—মৈঁ হুঁ! শ্রিফ বান্দর! না জান্‌তি তুম্‌? কোঁউ সাদি কিয়া মুঝ্‌কো?

তাহলে তো লোকটা জড়ভরত নয়। ও নিজেকে জানে। ও আমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে। দুরন্ত হীনমন্যতায় ও নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে এখন। তার চেয়েও বড় কথা—শাহ্‌জাদা খুররম্‌ যখন ওকে আর আমাকে নিয়ে বাঁদর-নাচ নাচাচ্ছিল তখন ও অদ্ভুতভাবে আত্মসংযম করেছে। সব বুঝেও না বোঝার ভান করে আমাদের দুজনকেই চরম অপমানের হাত থেকে অব্যাহতি দিতে চেয়েছে।

সে জানতো—ঐ নিয়ে প্রতিবাদ করলে সেটা দর্শকেরা তার বাঁদরামির বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নিত। কৌতুকে ফেটে পড়ত। আমি ওর হাতটা—যে হাতটা ওর পঙ্গু নয়—নিজ মুষ্টিতে তুলে নিয়ে বলেছিলুম, নহী! তুম্ জানবার না হো, তুম্ মেরি দুল্‌হন!

আমি কোয়াসিমোদোর নাম শুনিনি, তাই আমার সে-কথা মনে হয়নি; আপনারা ওর সে হাসিটা দেখলে লন চ্যানি, চার্লস লটন, কিংবা এ্যান্টনি কুইনের কথা ভাবতেন! ওর একটা চোখ ছোট আর একটা চোখ বড় হয়ে গেল। হঠাৎ সবলে আমার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে আবার হু হু করে কেঁদে উঠল হাসতে গিয়ে।

আমি কী একটা কথা বলতে যেতেই ও ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ালো। ডান হাতটা বাড়িয়ে কী যেন ইঙ্গিত করে। ওর নির্দেশমতো সেদিকে অগ্রসর হতেই একপাল সুন্দরী পর্দার আড়াল থেকে ছুটে পালালো। ওরা জড়ভরতের ফুলশয্যা দেখতে এসেছিল।

চার বছরের মাথায় আমার গর্ভে এল সন্তান।

বিশ্বসুন্দরী নূরজাহাঁ যা পারেনি তার আঠারো বছরের বিবাহিত জীবনে—তার মতে পুরুষশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীরের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে, তাই সফল হয়েছিল আমার জীবনে: মাতৃত্ব!

সবচেয়ে খুশি শাহ্‌জাদা শাহ্‌রিয়ার। বিশ বছর বয়স তখন তার। পিতৃত্বের মতো দুর্লভ সম্মান যে কোনদিন লাভ করতে পারবে এ যেন ওর কল্পনাতেই ছিল না।

কন্যা সন্তান হওয়ায় একমাত্র একজন মর্মাহতা; বেগম নূরজাহাঁ। জাহাঙ্গীর তখন প্রায় মৃত্যুর শিয়রে। ফলে নূরজাহাঁ তখন পরের জমানার কথা ভাবছে। নূরজাহাঁ তো কোনদিন বৃদ্ধা হবে না। অনন্ত যৌবনা সে মৃত্যুঞ্জয়ী! ফলে ভবিষ্যতের কথা তাকে আগে থাকতেই ভাবতে হয়। শাহ্‌রিয়ার 'ন-সুদনি'; তাকে গদিতে বসানো চলবে না। আমার কোল আলো করে যদি একটি পুত্র-সন্তান আসত তবে তাকেই শিখণ্ডী করে নূরজাহাঁ হিন্দুস্তানকে শাসন করে যেত আরও দু-এক শতাব্দী। অন্তত ওর ইচ্ছাটা তাই। খুদা সে সৌভাগ্য থেকে ওকে বঞ্চিত করেছেন। সেটাই সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য নয়, তখন তা বুঝিনি। বুঝেছিলুম আরও এক বছর পরে—জাহাঙ্গীর ফৌত হলে।

আচ্ছা, আমার এ কৃতিত্বে আজি-আম্মা খুশি হয়ে কি করত?

জানি না। আমাদের কাউকে কিছু না বলে কেন যে সে রাতারাতি নিরুদ্দেশ

হয়ে গেল তা আমি জানতে পারিনি।

সেই বিশেষ রাতটিতে, যেদিন আগ্রা কিল্‌লা থেকে পুরুষ বেশে পালাতে চেয়েছিলুম, তাকে শেষ দেখি! শেষ রাত্রের বাকি প্রহরটুকু চুপচাপ বসেছিলুম 'মুসম্মান বুর্জ'-এর একান্তে। ক্রমে পূব-আকাশ ফর্সা হয়ে এল। দড়ির মইটা ছিল যথাস্থানেই। হাওয়ায় দুলছিল। কিন্তু যমুনার দিক থেকে এল না কোনও আলোর সঙ্কেত। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখে জল এসে গেল। ক্রমে ভুক্কো তারা ডুবে গেল আলোর বন্যায়। তাকিয়ে দেখি, যমুনার ঘাটে বাঁধা আছে একটা ছোট্ট নৌকা। ছলাৎ-ছল, ছলাৎ-ছল - নীল যমুনার দোলায় সেটাও দুলছে। কিন্তু ঘাটে বাঁধা। জীবনতরী জলে ভাসল না। শক্ত লোহার আংটার সঙ্গে দোদুল্যমান নৌকাটা রজ্জুবদ্ধ।

সূর্যোদয়ের পর নেমে এলুম ছাদ থেকে। পোশাকটা পালটাই। আঁতি-পাঁতি খুঁজতে আসি আজি-আম্মাকে। আশ্চর্য! সে যেন হাওয়ায় উপে গেছে। ঘুম থেকে টেনে তুললুম মীনাবহিনকে। খবরটা শুনে একটু বিস্মিত হল। বললে, কোথায় আবার যাবে? আছে এখানে ওখানে।

কী করে ওকে বোঝাই। ও তো জানে না কী দুর্ধর্ষ একটা কাণ্ড হতে যাচ্ছিল কাল রাত্রে। সে জন্য আজি-আম্মাকে যে তখনই চাই আমার। জানতে হবে—কেন রুস্তম আসতে পারল না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখন কী করণীয়। বেলা বাড়ল। আজি-আম্মার সন্ধান মিলল না। পরে মীনাবহিনই নিয়ে এল তার খবর। আজি-আম্মা নাকি ভোর রাত্রে কাউকে কিছু না বলে কিল্‌লা থেকে পালিয়ে গেছে! কোথায় গেছে, কেন গেছে, কেউ জানে না। তবে অমরসিং দরওয়াজার শাস্ত্রী তাকে চিনতে পারে। রাত ভোর হলে যেই সাঁকোটা নামানো হল, অমনি সে পরিখা পার হয়ে দুর্গের বাহিরে চলে যায়। বেহারা সমেত একটি পালকি অপেক্ষা করছিল। আর ছিল একজন ঘোড়সওয়ার। তাকেও শনাক্ত করেছে প্রহরী – সিপাহ্‌শালার আসফ-খাঁর বাহিনীর রুস্তম খাঁ; ঐ আজি-আম্মার ছাওয়াল। সেই ভোর রাত্রে তারা কোথায় যেন চলে যায়। আজি-আম্মার কাছে ছাড়পত্র ছিল—কিল্‌লার বাহিরে যাবার অনুমতি; তাই প্রহরী কোন আপত্তি করেনি।

আমার কেমন যেন বিশ্বাস হয় না। তাহলে ঐ ভাবে দড়ি খুলবে কেন কিল্‌লার কুঞ্জর থেকে, ঘাটে বাঁধা থাকবে কেন নৌকাখানা? সরাসরি গিয়ে দরবার করলুম বেগম-সাহেবার মহলে। মা বললে, হ্যাঁ, কদিন ধরেই আজি-আম্মার ধরন ধারণ আমার ভাল লাগছিল না। নোক্‌রি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে

চায় সে-কথা বললেই হত! সে তো আর ক্রীতদাসী ছিল না!

—তুমি ঠিক জান, আজি-আম্মা ভোররাত্রে ওভাবে পালিয়ে গেছে?

নূরজাহাঁ জবাব দেয়নি। নিঃশব্দে উঠে গেল পাশের ঘরে। ফিরে এল একখানা পাঞ্জাছাপ নিয়ে। স্বয়ং বাদশাহ্‌র পাঞ্জাছাপ, নিচে আজি-আম্মার টিপ ছাপ। আজি-আম্মার বিস্তারিত পরিচয়ও তাতে লেখা। এটা ওর শনাক্তকরণ চিহ্ন। আমার বিশেষ পরিচিত। বহুবার দেখেছি আজি-আম্মার হেপাজতে। দুর্গের বাইরে যাবার ছাড়পত্র। নূরজাহাঁ বলে, যাবার সময় প্রথামাফিক এই পাঞ্জাছাপটা জমা রেখে গেছে। সেটাই নিয়ম, যাতে ঐ পাঞ্জাছাপের সাহায্যে দুর্গের বাইরে কোনও খিদ্‌মদগার কিছু অন্যায় না করতে পারে। এ থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় - যে কোন কারণেই হোক আজি-আম্মা ভোর রাত্রে দুর্গের বাইরে গেছিল। কী ছিল তার পরিকল্পনা, কী জন্য তাকে কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে যেতে হল কিছুই আন্দাজ করতে পারি না। যা হোক, সে ফিরলেই বোঝা যাবে। ধাক্কা খেলুম মায়ের পরের কথাটায়। পাঞ্জাছাপখানা আমাকে দিয়ে বললে, এটা তোর কাছেই রাখ্‌ লাড্‌লী। একটা স্মৃতিচিহ্ন তবু রইল। হাজার হোক সে তো তোর দুধ-মা।

হঠাৎ এ-কথা কেন? আজি-আম্মা ফিরে আসবে না কেন? জানতে চাইলুম সে কথা।

নূরজাহাঁ নির্লিপ্তের মতো বলে, ফিরে আসে ভালই। তখন যার পাঞ্জাছাপ তাকেই দিবি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে ফিরবে না। জানি না, সে কী হাতিয়ে নিয়েছে—কিন্তু বেশ মোটারকম কিছু হাতসাফাই না করলে মায়ে-পোয়ে এভাবে পালাতো না।

পাঞ্জাছাপটা বরাবর ছিল আমার হেপাজতে।

শেষ মুহূর্তে কেন যে ওরা পরিকল্পনাটা বদল করেছিল তা জানতে পারিনি।

তবে পরে ভেবে দেখেছি - সেই সন্ন্যাসী, কী যেন নাম?—হ্যাঁ, অভিরাম-স্বামী - তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী ব্যর্থ হয়নি। হিন্দুরা ঐ ফার্সি শব্দ 'বাদ্‌শাহ্‌' কথাটা সচরাচর ব্যবহার করে না। 'বাদশাহ,' হচ্ছে তাদের কাছে 'রাজা'। আর বোধকরি সেই সর্বজ্ঞ সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে স্ত্রৈণ জাহাঙ্গীর আদৌ 'বাদশাহ' নন্— বেগম নূরজাহাঁর স্বামী মাত্র! তাই শাহ্‌রিয়ার বাদশাহ্‌জাদা নয়, এক ধাপ ডিঙিয়ে সে সরাসরি তার পিতামহের পৌত্র। রাজার নাতি!

এছাড়া আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে?

দিন যায়।

ইতমদ্‌উদ্দৌলা দেহ রাখলেন যে বছর পারস্য সম্রাট শাহ্‌ আব্বাস কান্দাহার আক্রমণ করে। অর্থাৎ যে বছর খস্‌রৌকে অম্লশূলের ব্যথায় হত্যা করা হল।

1627 খ্রীষ্টাব্দে মারা গেল জাহাঙ্গীর।

অপ্রতিরোধ্য খুররম্‌ অনায়াসে উঠে বসল তক্ত-তাউসে। ইতোমধ্যে কোটিপতি নূরজাহাঁ সাড়ম্বরে সমাপ্ত করেছে যমুনাপুলিনে তার পিতার সমাধিঃ ইতমদ্‌উদ্দৌলার মক্‌বারা! কী তার জৌলুষ! "কী সূক্ষ্ম, কী নিখুঁত কারিগরী। জ্যামিতিক মাপজোখের যেন হদ্দমুদ্দ হয়ে গেছে। দেওয়ালের গায়ে পাথরে খোদাই করা 'স্টিল-লাইফ পেইন্টিং'। ফুলদানীতে পুষ্পগুচ্ছ, প্রসাধন-মঞ্জুষা, সুরা-ভৃঙ্গার, ফলের পাত্র, পানের মদিরা-চষক। দেখতে দেখতে মনে থাকে না— এ নক্‌শাগুলি এক সমাধিসৌধের দেওয়ালে খোদাই করা। মনে হয় যেন, বিলাস-ব্যসনের প্রয়োজনে নির্মিত এ বুঝি কোন্‌ হারেম-রঙমহলের দেওয়াল। ঐ ঠাস্‌বুনট অলঙ্কার আর সুরাভৃঙ্গারের মাঝে মাঝে কুরাণ-সরিফের বাণী উৎকীর্ণ করা। সেগুলিকে ঐ পরিবেশে যেন প্রহসন বলে মনে হয়।"

এ মক্‌বারার কেন্দ্র স্থলে নূরজাহাঁর পিতামাতার সমাধি। এক পাশের সন্দৌখ্‌টি তার ভ্রাতার—আর্জুবান্‌ বেগমের পিতার জন্য সংরক্ষিত। আর তিনটি আপতিত শূন্যগর্ভ। ইতমদ্‌উদ্দৌলার কথা থাক। খুররমের কথা বলি।

জাহাঙ্গীরের দেহান্তে গদিতে চড়েই শাহজাহাঁ শুরু করে দিল তার অপশাসন।

1628 সালের উনিশে জানুয়ারী শাহজাহাঁর অভিষেক হল।

পরদিনই সম্রাটের হুকুমনামা হাতে আগ্রা কিল্লায় উপনীত হল খিদ্‌মৎ পার্স্ত খাঁ।। গ্রেপ্তার করল জাহাঙ্গীরের বংশের সবাইকে। খুস্‌রৌর পুত্র দাওয়ার বক্স—যে একদিন উন্মাদের মতো ছুটে গিয়েছিল 'ন্যায়শৃঙ্খল'-এ ঘণ্টা বাজাতে; আর তার ছোট ভাই নিতান্ত নাবালক গুর্সাম্পকে—সেই যাকে আমার কোলে তুলে দিয়ে স্বামীর বিরহ সইতে না পেরে প্রাণ দিয়েছিলেন খস্‌রৌর সহধর্মিণী। শাহজাহাঁর বেহেস্ত-আসীন খুল্লতাত দানিয়েলের দুই নাবালক পুত্র—তাহমুর্স আর হোসবং। সংবাদ পেয়ে উন্মাদের মতো ছুটে এল সদ্যবিধবা নূরজাহাঁ। চিৎকার করে নূরজাহাঁ বলে ওঠে, এ কী করছ পার্স্ত খাঁ! কোথাও কিছু ভুল হয়েছে নিশ্চয়! এরা তো নাবালক—নিতান্ত—দুগ্ধপোষ্য! এদের কী অপরাধ? কেন এদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছ?

খিদ্‌মৎ পার্স্ত খাঁ আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করল। চোখ তুলে এই প্রথম দেখতে চাইল সেই ভুবনমোহিনী ভারতেশ্বরীকে। আজ তিনি অনবগুণ্ঠিতা! আতঙ্কের তুঙ্গশীর্ষে উঠে ভুলে গেছেন 'পর্দা'!

কিন্তু দেখতে পেল না। ইমান-ইনসাফের মালকিন, হিন্দুস্তানের ভাগ্য-বিধাত্রীর মৃত্যু হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে। ওর সামনে দণ্ডায়মানা অনবগুণ্ঠিতা এক সত্তবিধবা। তাঁর স্বর্ণখোচিত রক্তচীনাংশুক, রাজমুকুট, শতনরী, কোটি কোটি টাকার অলঙ্কার সরে গেছে নেপথ্যে। তিনি নিরাভরণা। যদিও তাঁর সৌন্দর্য প্রায় অম্লান!

লোকটা বললে, গোস্তাকী মাফি কিয়া যায় হুজুরাইন! বান্দার উপর এই রকমই হুকুম হয়েছে। ফর্মান দেখে মিলিয়ে নিন। শুধু এঁরা নন, বেগম-সাহেবা —আমার তালিকায় আরও একটি নাম আছে: আপনার দামাদ।

—আমার দামাদ?

—জী সরকার! আল্লাতালা তাঁর হাজার বরিষ্‌ পরমায়ু মঞ্জুর করুন: শাহজাদা শাহরিয়ার।

আমি মর্মর স্তম্ভটা দুহাতে আঁকড়ে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করি। পারি না। ধীরে ধীরে বসে পড়ি নক্সা-কাটা মার্বেলের মেঝেতে। তামাম হিন্দুস্তানের প্রাক্তন মালকিন নির্বাক। কে বলবে পঞ্চাশোর্ধ্বা মেহেজবীন! গাত্র চর্ম মসৃণ—যেন অনাঘ্রাতা কিশোরী; আজানুলম্বিত কুঞ্চিত কেশদাম—যেন 'শালিমার-বাগ'-এর ঝরোকার বীচীভঙ্গ; দৃঢ় নিবদ্ধ কঞ্চুলিকার অবরোধ ভেদ করতে চাইছে যেন যুবতী নারীর যুগ্ম কামনা-বাসনা! শুধু চোখের জলে সুর্মাটা ধুয়ে গেছে—আনারকলির মতো রাঙা কপোলে নেমেছে দুটি কলঙ্করেখা! বৃদ্ধা-তরুণী যুক্ত করে কাতরকণ্ঠে শুধু বললেন, পাস্ত খাঁ! আমি মিনতি করছি—তোমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ আমিই রোধ করেছিলাম একদিন—একবার···শুধু একবার আমাকে নিয়ে চল শাহ্‌-য়েনশাহ্‌র দরবারে! আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলব···তাঁর চরণ ধরে ভিক্ষা চাইব! শাহ্‌রিয়ারকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই! সে কোনদিন বিদ্রোহ করবে না! সে তো জড়ভরত। একটা···একটা অবোধ পশু···

লোকটা আভূমি নত হয়ে দ্বিতীয়বার কুর্নিশ করল। কী একটা কথা বলতে গেল—বলা হল না। বাধা পেল। কারণ ঠিক তখনই পাশের ঘরের সাচ্চা-জরির পর্দা সরিয়ে বার হয়ে এল বিংশতি বর্ষীয় এক পুরুষ। পুরুষ-সিংহ! মাথা সোজা রেখে! তার ডান কোলে একটি ঘুমন্ত শিশুকন্যা। এক বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে। এক পা এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে ঘুমন্ত শিশুকে নামিয়ে দিল ভূলীন আমার কোলে। আমাকে একটা কথাও বলল না। ঘুরে দাঁড়ালো তার শাশুড়ীর মুখোমুখি। কোন জড়তা নেই কণ্ঠে, বললে, মাফি কিয়া যায় বেগম-সাহেবা! আপ্‌ নেহী জান্‌তি কি নূরজাহানে বে-অকুক নেহী থি! দামাদ

চুন্‌তে হুয়ে উন্‌হোনে কোই জানবার নহী চুনি !

এবার সে মুখোমুখি হল পার্স্ত খাঁর। ডান হাতখানাই শুধু বাড়িয়ে ধরে শৃঙ্খলের প্রত্যাশায়। বাঁ হাতখানা তুলতে পারে না। সেটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

শাহজাহাঁ মসনদে উঠে বসার পক্ষকালের মধ্যে ঘটে গেল অনেকগুলি ঘটনা।

বাবুর থেকে হুমায়ুন, হুমায়ুন থেকে আকবর, আকবর থেকে জাহাঙ্গীরের সংক্রমণে হিন্দুস্তান দেখেছিল পিতা থেকে পুত্রের জমানায় প্রত্যাশিত পরিবর্তন। বাবুরের ভগ্নী গুলবদন বেগমের স্মৃতিকথায় জানতে পারি—মৃত্যুশয্যায় বাবুর বাদশাহ্‌ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুনকে শেষ অনুজ্ঞা জানিয়ে গেছিলেন – তোমার তিন ভাইয়ের শত অপরাধ ক্ষমা কর। হুমায়ুন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন – তিন ভাইকে দিয়েছিলেন তিনটি অঞ্চলে শাসনকর্তার পদ। তাঁরা তিনজনেই বারে বারে বিদ্রোহ করেছেন এবং হুমায়ুন তাদের পরাজিত ও গ্রেপ্তার করে পরে মুক্তি দিয়েছেন। ভ্রাতৃরক্তে হাতকে কলঙ্কিত করেননি। আকবর সিংহাসনে বসেন মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে। তাঁর অভিভাবক বৈরাম খাঁ বিদ্রোহ করেন। আকবর বৈরামকে পরাজিত ও গ্রেপ্তার করেন, কিন্তু সসম্মানে মুক্তি দেন। বৈরাম পুত্র আবদুর রহিম খান-ই-খানান ছিলেন তাঁর অন্যতম সভারত্ন। জাহাঙ্গীরের যতই দোষ থাক, ভ্রাতৃরক্ত তাঁর হাতে লাগেনি। মুঘল রাজবংশে সেই ট্রাডিশন প্রথম ভাঙলো খুররম – 'শাহজাহাঁ' হবার সঙ্গে সঙ্গে।

এবার মনে হল দিল্লী বুঝি কোন বৈদেশিক দিগ্বিজয়ীর করতলগত। জাহাঙ্গীরী-মহল থেকে যাবতীয় সুন্দরী নারীকে বেছে বেছে স্থানান্তরিত করা হল। ওর অভিষেকের তৃতীয় দিনে শাহ্‌য়েন-শাহ্‌র ফর্মান নিয়ে কারাগারে উপনীত হল সেনাপতি আসফ খাঁ। স্থির মস্তিষ্কে হুকুম দিল বন্দীদের বধ্যভূমিতে নিয়ে আসতে। সারি সারি দাঁড়ালো শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীর দল – শিহাবউদ্দীন শাহজাহাঁ বাদ্‌শাহর নিকটতম আত্মীয়বর্গ, যাদের ধমনীতে জাহাঙ্গীরের রক্তের ছিটে ফোঁটা আছে। খস্‌রৌর দুই পুত্র – একাদশবর্ষীয় দাওয়ার বক্স আর সপ্তম-বর্ষীয় গুর্সাস্প ; খুল্লতাত দানিয়েলের দুই নাবালক পুত্র তাহ্‌মুর্স আর হোসাং। আর খুররমের কনিষ্ঠতম ভ্রাতা – 'নসুদনি' শাহজাদা শাহরিয়ার।

কারাগার-সংলগ্ন এ বধ্যভূমির চারিদিকে উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে হিন্দু মন্দিরে যেমন বলিদানের ব্যবস্থা থাকে তেমনি কাঠের তৈরী প্রকাণ্ড যূপকাষ্ঠ। সারবন্দি বন্দীদের নিয়ে আসা হল সেখানে। ওখানে আগে থেকেই উপস্থিত আছে তিনজন রাজকর্মচারী। নাঙ্গা-তলোয়ার হাতে সিপাহ্‌শালার

আসফ খাঁ স্বয়ং। এবং তার একজন সহকারী। তার কাজ শুধু নয়ন মেলে হত্যানুষ্ঠানটুকু দেখা। সে বাদশাহ্‌র অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। তার দায়িত্ব শুধু ফিরে গিয়ে শাহ্-য়েন শাহ্‌কে মৌখিক জানানো—প্রতিটি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর শিরশ্ছেদ হতে সে স্বচক্ষে দেখেছে। তৃতীয় ব্যক্তি একজন খিদ্‌মৎদার —তার হাতে প্রকাণ্ড বড় একটি রূপার পরাৎ। ছিন্ন শিরগুলি সে সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে। যাতে বিশ্বস্ত অনুচরের জবানবন্দি ছাড়াও বাদশাহ্ চিনে নিতে পারেন রামের বদলে রহিমকে হত্যা করা হয়নি।

আসামীদের মধ্যে শাহ্‌জাদা শাহ্‌রিয়ারই বয়ঃজ্যেষ্ঠ। তাকে সম্বোধন করে সিপাহ্‌শালার জানালো—সম্রাটের আদেশ পালন করছে সে। তাকে যেন ক্ষমা করা হয়। আহ্বান জানালো শাহ্‌রিয়ারকে যূপকাষ্ঠের দিকে এগিয়ে আসতে। শাহ্‌রিয়ার একপদ অগ্রসর হবার উপক্রম করতেই দাওয়ার বক্স তার আঙরাখার প্রান্ত চেপে ধরে: আপ্ ঠাহ্‌রিয়ে চাচাজী!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শাহ্‌রিয়ার। একাদশ বৎসরের বালক তখন আসফ খাঁকে সম্বোধন করে জানতে চায়—সম্রাটের নির্দেশে কি লেখা আছে—কী পর্যায়ক্রমে আসামীদের কোৎল করা হবে?

আসফ খাঁ একটু ঘাবড়ে যায়। বলে, না বলা হয়নি। যেহেতু শাহ্‌রিয়ার বয়ঃজ্যেষ্ঠ···

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে দাওয়ার বক্স রাজোচিত-গাম্ভার্যে বললে, আপনি নগণ্য সিপাহ্‌শালার। বন্দীদের ধমনীতে বইছে মুঘল রাজরক্ত—এরা সবাই ইমান হুনসাফের মালিক শাহ্-য়েন-শাহ্ জালালুদ্দীন আকবরের বংশধর। এঁদের মধ্যে কে আগে প্রাণ দেবেন সে কথা নির্ধারণ করার কী অধিকার আছে আপনার? আপনি তো মুঘল রাজবংশের বেতনভুক নোকরমাত্র!

আসফ খাঁর মুখটা রক্তিম হয়ে ওঠে। ঢোক গিলে বলে, কিন্তু সেই অজুহাতে তো সম্রাটের ফরমান মুলতুবী রাখা যায় না?

—কে বলেছে মুলতুবী রাখতে? বাদশাহ্ যখন গল্‌তি করেছেন তখন তাঁর অবর্তমানে যে ন্যায্য হক্‌দার তার হুকুম তামিল করুন, সিপাহ্‌শালার!

—কে তিনি?

—ম্যয় হুঁ! আমি শাহ্-য়েন-শাহ্ জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র! শরিয়তী কানুনে আমিই হুকুমজারীর হক্‌দার!

আসফ খাঁ আশ্বস্ত হয়। বলে, বেশ, তুমিই এস তাহলে প্রথমে···

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে একাদশবর্ষীয় বালক: 'তুম্' নহী, 'আপ্', ! ভুলে

যাবেন না সিপাহ্‌শালার—আপনি বাবুর বাদশাহের অধস্তন পুরুষের সঙ্গে কথা বলছেন। বাদ্‌শাহ্‌র অবর্তমানে হক্‌দারের হুকুম তামিল করছেন।

আসফ খাঁর মুঠিটা তরোয়ালের উপর চেপে বসল। কথা ফুটল না মুখে।

দাওয়ার বক্স বললে, বড় থেকে ছোট নয়, ছোট থেকে বড়। সবার আগে শহীদ হবে গুর্সাস্প! এতগুলি মৃত্যুদৃশ্য দেখার যন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি দিতে চাই আমি। আপনি আমার হুকুম তামিল করুন।

আসফ খাঁ নতনেত্রে বললে, ঠিক হ্যায়! ম্যয় নে মান্‌লি।

ছয় বছরের বালক গুর্সাস্প ভয়ে নীল হয়ে দাঁড়িয়েছিল পাশেই। দাওয়ার বক্স তাকে আলিঙ্গন করল। বললে, আব্বাজানকে তুই কখনো দেখিস্‌নি! আমার কাছে বারে বারে জানতে চাইতিস্—কেমন মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর কাছেই তো যাচ্ছিস্‌রে মুন্না! ভয় কি? যা, এগিয়ে যা! লিকিন মাথা খাড়া রেখে।

গুর্সাস্প একপদ অগ্রসর হতেই শাহ্‌রিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্রকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল।

গুর্সাস্প অচঞ্চল পদক্ষেপে এগিয়ে গেল যূপকাষ্ঠের দিকে…

গুর্সাস্পের পর হোসাং, তারপর তাহ্‌মুর্স।

খিদ্‌মদগার রক্ত মুছে তিন তিনটি শিশুমুণ্ড সংগ্রহ করল রূপার পরাতে।

শাহ্‌রিয়ার এবার আলিঙ্গন করল দাওয়ার বক্সকে। এক হাতে তাকে বক্ষপঞ্জরে টেনে নিয়ে শাহ্‌রিয়ার শুধু কানে কানে মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে শুনিয়ে দিল কালেমা তয়েব: 'লা ইল্লাহা ইল্লা লাহা; নূর-মহম্মদ রসুল্‌-আল্লাহ্‌।'

দাওয়ার বক্স পুনরুক্তি করল সেই মন্ত্রের। তারপর বললে, চাচাজী! এবার আপনি ·

—ম্যয়। কেঁউ? আমি তো তোমার চেয়ে বয়সে বড়?

—তা হোক। আপনি আমাকে বড় ভালবাসেন! আপনাকেই বা আমার মৃত্যুদৃশ্য দেখার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেব না কেন?

শাহ্‌জাদা শাহ্‌রিয়ার এত দুঃখেও বীভৎস ম্লান হাসল। হাসলে মনে হয় সে কাঁদছে। বললে, তা হয় না, মুন্না। আমি তোর চাচাজী। জীবনের শেষ মুহূর্তে আমাকে একটা সান্ত্বনা নিয়ে যেতে দাও! একটা সাক্ষী! যে দুনিয়াকে বলবে—শাহ্‌জাদা শাহ্‌রিয়ার 'ন-সুদনি' ছিল না।

দাওয়ার বক্স আভূমি নত হয়ে সেলাম করল চাচাজীকে। বললে, গুস্তাকি মাফ কিয়া যায়! এরপর আর কোনও কথা চলে না। যাইয়ে আপ—পহিলে।

শাহ্‌রিয়ার যে ন-সুদনি ছিল না এ কথা দুনিয়াকে জানাবার জন্য একজন সাক্ষী রইল। কয়েকটি খণ্ড-মুহূর্তের জন্য যদিও।

তাই ইতিহাস জানতে পারেনি—লাডলি বেগমের স্বামী 'ন-সুদনি' ছিল না।

ছিল মুঘল-রাজবংশের সাচ্চা শাহ্‌জাদা।

ঐ গণভ্রাতৃহত্যার পক্ষকাল পরে আগ্রা-কিল্লায় এক বর্ণাঢ্য বিজয় উৎসবে যোগদান করতে এল হিন্দুস্তাঁর নয়া শাহ্-য়েন-শাহ্-হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের সাজে সেজে। সেদিন দিলখুশ্ বাদশাহ্ তার পেয়ারের আর্জুবানু বেগমকে দুইলক্ষ আসরফি উপহার দেন। ঐ সঙ্গে বার্ষিক দশলক্ষ আসরফির মাসোহারার ইন্তেজাম।[17] পক্ষকালপূর্বের গণহত্যার চিহ্নমাত্র নেই তাই আচরণে।

কী বিচিত্র এই দুনিয়া।

ঐ ঘটনার চার বছর পরে চতুর্দশতম সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে বুরহানপুর কিল্লায় মারা গেলেন আর্জুবানু-বেগম!

1631 খ্রীষ্টাব্দ। শাহজাহাঁ এসেছিলেন দাক্ষিণাত্যে, বিদ্রোহী খান-জাহান লোদীকে শায়েস্তা করতে। আশ্রয় নিলেন বুরহানপুরে, মালোয়া রাজ্যে—গোলকুণ্ডা আর বিজাপুরের কাছাকাছি। যথারীতি মমতাজও এসেছেন সম্রাটের সঙ্গে। সম্রাট যে তাঁকে ছাড়া থাকতে পারেন না—যদিও তাঁর একাধিক পত্নী ছিল আগ্রা কিল্লায়। মুরাদ-এর জন্মের পর তিন-তিনটি সন্তান হয়েছে মমতাজের, গত পাঁচ বছরে, 1625 থেকে 1630-এর ভিতরে। তিনটিই সূতিকাগারে মারা গেছে। মমতাজের বয়স তখন চল্লিশ। বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন তিনি। হাকিম-সাহেব আপত্তি করেছিলেন—এই অসুস্থ শরীরে বেগম-সাহেবার দাক্ষিণাত্য যাওয়াটা ঠিক হবে না; কিন্তু সম্রাট শাহ্‌জাহাঁর যে উদগ্র পত্নীপ্রেম। পেয়ারের বেগমের মুখখানা দিনান্তে একবার না দেখলে তাঁর দিল্ টুটে যায়।

অগত্যা আসতে হল বেগম-সাহেবাকে।

এবং এসেই তিনি গর্ভিণী হয়ে পড়লেন!

সাতই জুন যুদ্ধশিবিরে দ্রুতগামী অশ্বারোহী সংবাদ নিয়ে এল মমতাজ-মহল চতুর্দশ সন্তানের জননী হয়েছেন। কন্যারত্ন। শিশু ভালই আছে।

—আর তার মা?—উৎকণ্ঠিত বাদশাহ জানতে চান।

সংবাদবহ নতশিরে নিবেদন করে, জিন্দা, লেকিন মখ্সুর।

মখ্সুর! মারাত্মকভাবে পীড়িত! দ্রুতগতি অশ্বপৃষ্ঠে শাহজাহাঁ রণক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন বুরহানপুর কিল্লায়। দ্বিতলের একটি কক্ষে প্রসূতি শয্যালীনা। সম্রাটকে সে-কক্ষে প্রবেশ করতে দিলেন না হাকিম-উল-মুলুক ওয়াজির আলি খান। বললেন, প্রসূতি নিদ্রাগতা, অত্যন্ত কাহিল। কোনরকম

উত্তেজনা তাঁর বরদাস্ত হবে না। জাহাঁপনা বরং বিশ্রাম নিতে যান। বেগম-সাহেবা একটু সুস্থ বোধ করলেই তাঁকে সংবাদ দেওয়া হবে।

সম্রাট এ আদেশ মেনে নিতে বাধ্য হলেন। মেহ্‌মান-খানার দক্ষিণদিকের কামরায় বিশ্রাম নিতে গেলেন। নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ইতিহাসকার তুলনা দেননি; দিতে হলে, বলতে হয় সদ্যপ্রসূতি গুলর্যাম্প-জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি না পেয়ে নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে একদিন যেভাবে শাহ্‌জাদা খসরৌকে যেতে হয়েছিল দাক্ষিণাত্যে।

ক্লান্ত শরীরে নরম কামদার পালঙ্কে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়লেন যুদ্ধক্লান্ত সম্রাট। আশ্চর্য ঘটনাচক্র! ঠিক এই মেহ্‌হান-খানার এই কক্ষেই, এই পালঙ্কেই সে রাত্রে নিদ্রা যাচ্ছিলেন শাহ্‌জাদা খসরৌ—যখন আলি রেজা মধ্যরাত্রে তাঁর ঘুম ভাঙায়।

ঠিক তেমনিভাবে কে যেন করাঘাত করল দ্বারে।

সম্রাট দ্বার খুলে দিলেন, কে? কী চাই?

সংবাদ গুরুতর। মমতাজ মহলের মৃত্যু আসন্ন। সম্রাটকে শেষ দেখা দেখতে চান।

শাহজাহাঁ তৎক্ষণাৎ চলে এলেন প্রসূতি-আগারে। মুহূর্তে নির্জন হয়ে গেল মৃত্যুশীতল কক্ষটি। শুধু দাঁড়িয়ে রইল সাতিউন্নিসা, সম্রাজ্ঞীর একান্ত সহচরী; আর রইলেন হাকিম-সাহেব। সম্রাট নীরবে এসে বসলেন মৃত্যুপথযাত্রীর শয্যাপার্শ্বে। তুলে নিলেন তাঁর রোগপাণ্ডুর শীর্ণ হাতখানি। মমতাজের বাকশক্তি রোধ হয়নি। মনে হল, তিনি যেন একটা কথা বলতে চান।

শাহজাহাঁ ঝুঁকে এলেন।

মমতাজ সেই মৃত্যুতীর্থের সর্বোচ্চ সোপানের উপর দাঁড়িয়ে শাহ্‌জাহাঁকে কী বলেছিলেন তার ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। লোকগাথা বলে, তিনি বিদায় মুহূর্তে নাকি এক আখির-আর্জি পেশ করেছিলেন—তাঁর মকবারা যেন সম্রাটের মহব্বতের উপযুক্ত হয়!

সূর্যোদয়ের পূর্বেই তাঁর সব যন্ত্রণার অবসান হল।

ইতিহাসকার আবদুল লাহোরী বলছেন, "পুরো আটদিন সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষের অর্গল উন্মোচিত হয়নি। মেহমান্‌খানায় সঞ্চিত পানীয় তিনি গ্রহণ করেছিলেন কিনা জানবার উপায় নেই, কোন খাদ্যদ্রব্য কেউ নিয়ে যায়নি কামরার ভিতর সমস্ত ভারতবর্ষ রুদ্ধ-নিশ্বাসে প্রহর গণছিল সে কয়দিন। অষ্টম দিনে নিজে থেকেই দ্বার খুলে বেরিয়ে এলেন শাহ্-য়েন-শাহ।

"রুদ্ধবাক বিস্ময়ে সবাই বজ্রাহত হয়ে গেল।"[14]

"সম্রাটের দেহাকৃতিতে এক আশ্চর্য রূপান্তর ঘটেছে : সম্রাট কেমন যেন কুঁজো হয়ে গেছেন। তার বায়সকৃষ্ণ কেশরাজী বিল্‌কুল সফেদ। দেওয়ান-ই-আম-এ সবাই তার চেয়েও অদ্ভুত একটা কথা কানাকানি করত : এ কী তাদের দৃষ্টিভ্রম, নাকি মমতাজের মৃত্যুর পর সম্রাট সত্যই আকারে ছোট হয়ে গেছেন ?"[15]

ইতিহাসে যে-কথাটা লেখা নেই তা হল এই—বুরহানপুর কিল্‌লার মেহমান-খানার যে কক্ষটিতে সপ্তদিবস রজনী শাহজাহাঁ মরণান্তিক যন্ত্রণায় স্বেচ্ছানির্বাসনে বন্দী ছিলেন সেই কক্ষটিতেই, হসিসিয়ুন আলি রেজার হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন শাহ্‌জাদা খস্‌রৌ। নয় বছর পূর্বে।

বিধবা হয়েছিলুম আঠাশ বছর বয়সে। বাকি বৈধব্য-জীবন কেটেছে প্রাক্তন নূরজাহাঁর সান্নিধ্যেই। আমার বৈধব্যের পর তিনি বেঁচেছিলেন দীর্ঘ আঠারো বছর। আমাকে নিকায় বসার প্রস্তাবটা করতে কোনদিন সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি। পরিবর্তন তাঁরও হয়েছিল, হচ্ছিল—কিন্তু অতি ধীরে ধীরে। সাত দিনে শাহ্‌জাহাঁর কালো চুল সাদা হয়ে গেছিল ; কিন্তু নূরজাহাঁর পরিবর্তনটা অমন দ্রুতহারে হয়নি। তিল তিল করে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে। মাঝে মাঝে তাঁর যৌবনের প্রতিহিংসাপরায়ণতা, তাঁর দার্ঢ্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠত—'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত' মন্ত্রটা অভিভূত করে ফেলত তাঁকে। কিন্তু আমার ধমকে সামলে নিতেন। কি জানি-কেন—আমাকে ঐ সময় থেকে তিনি সমীহ করে চলতে শুরু করেন ; বোধকরি কিছুটা ভয়-মিশ্রিত দূরত্ব। অথচ সবকিছু হারিয়ে তিনি যে আমার বুকে মুখ গুঁজে হু হু করে কেঁদে উঠবার জন্য মাঝে মাঝে উন্মাদ হয়ে উঠতেন তা টের পেতুম। যে কোন কারণেই হোক, সেটা পেরে উঠতেন না। কোথায় যেন একটা পাপবোধে পীড়িত হতেন তিনি।...একদিনের ঘটনা বিশেষ করে মনে পড়ছে।

শাহ্‌জাহাঁ ফিরে এসেছেন বুরহানপুর থেকে। আর্জুবানুর মরদেহ রাখা আছে বুরহানপুর কিল্‌লাতেই। মক্‌বারা বানানো হলে তা স্থানান্তরিত করা হবে। সম্রাট যথারীতি রাজকার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন। সকালে উঠে নামাজ পড়েন, সূর্যোদয়ের পরে যুথিকা মঞ্জিলে এসে প্রজাবর্গকে ঝরোকা-দর্শন দেন, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাশ্‌-এ উপস্থিত হয়ে দৈনন্দিন রাজকর্ম করে যান ঘড়ির কাঁটা ধরে। কিন্তু সন্ধ্যার পর নাচগানের আসরে তিনি উপস্থিত হন না।

বড় একটা। মুসম্মান বুর্জের চত্বরে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকেন একা। তখন বিশেষ প্রয়োজনেও কেউ তাঁর সম্মুখীন হতে সাহস পায় না। সম্রাটের অন্য কোন পত্নীরা নয়, উপপত্নীরা নয়। একমাত্র তাঁর জ্যেষ্ঠাকন্যা মাঝে মাঝে গিয়ে দাঁড়ায় তাঁর পাশে। পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। জাহান-আরাকে সম্রাট অত্যন্ত ভালবাসতেন।

সম্রাটের এই বিরহযন্ত্রণা নিয়ে কিল্লায় সবাই কানাকানি করত। কীভাবে আবার তাকে স্বাভাবিক মানুষে পরিণত করা যায়। ঐ সময়েই একদিন নূরজাহাঁ আমাকে এসে বললেন, হ্যাঁরে লাডলি, তোর সাদির সময় খুররম্ যে সোনা-মোড়ানো ডুগডুগিটা দিয়েছিল, সেটা আছে? দে তো?

আমি সেটা বার করে এনে ওঁর হাতে দিলুম। জানতে চাইলুম, কী হবে ওটাতে?

—শাহ্-য়েন-শাহ্‌কে উপহার দেব। সন্ধ্যাবেলায় ওর তো কাজে মন বসে না। একট ডুগডুগি বাজিয়ে সময়টা কাটাতে পারবে।

আমি অবাক বিস্ময়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকি। এত এত আঘাতেও 'নূরজাহাঁ' তাহলে মরেনি!

ও আমাকে ভুল বুঝল। ভাবল, আমি ভয় পেয়েছি। তাই বলে, ভাবিস্ না পার্স্ত খাঁ এবার এসে আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে! মুক্তি আমার মুঠোয়!

অনামিকার অঙ্গুরীয়টি দেখায়। জানতুম, তাতে ঠাশা আছে তীব্র বিষ। গ্রেপ্তার হবার আগেই মৃত্যু হতে পারে যার সাহায্যে। নূরজাহাঁ ওর আঙরাখা থেকে একটি কাগজ বার করে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে। বলে, ঐ ডুগডুগির সঙ্গে পাঠিয়ে দেব এই বয়েৎটা।

নূরজাহাঁর স্বরচিত একটি ফার্সি বয়েৎ:

"তুরা ন তুকুম-এ-লাল আস্ত্ বার কিবা-এ হারীর।
শুদস্ত্ কাত্রা-ই-খুন-এ মনৎ গরিবান গীর ॥*

আমি শুধু বললুম: ছিঃ।

—'ছি' কিসের? ওর এ যন্ত্রণা কি আমার প্রতি অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত নয়?

—সে কথা আমি বল্‌ছি না, আম্মা। ঐ কবিতাটি কী জন্য লিখেছিলে?

* তোমার রেশমী আঙরাখার ঐ যে চুনিপাথর
জান, সেটা কেন অমন রক্তিম?
বন্ধু! ওটা যে আমারই রক্তবিন্দু।

প্রতিশোধ নিতে? ভুলে যেও না—আকবর বাদশাহ্ গাধার গলায় বাইবেল গ্রন্থটা ঝুলিয়ে দিতে রাজী হননি। তুমি যে তাই করতে চলেছ?

নতনেত্রে কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর মেনে নিলেন আমার যুক্তি—তুই ঠিকই বলেছিস্ মুন্নি। হাজার হোক, আমি তো কবি।

সেদিন ঐ 'মুন্নি' ডাকটা আমার কানে বেসুরো লাগেনি!

এখন আমরা তিনজনে একসঙ্গে থাকি। জাহাঙ্গীরী-মহলে থাকেন শাহজাহাঁ। মীনা মস্‌জিদের উত্তরের সেই বাঁদী-মহালের সুচিহ্নিত কামরাটায় থাকতুম আমরা। আমি, মীনাবহিন, আর আব্বি-আম্মার পরিত্যক্ত পালঙ্কে প্রাক্তন ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহাঁ।

পিতার মৃত্যুতে কোটিপতি নূরজাহাঁ নির্মাণ করেছিলেন অতুলনীয় ইতমদ্-উদ্দৌলা মক্‌বারা, আগ্রায়, যমুনা পুলিনে। স্বামীর যখন মৃত্যু হল তখন তিনি কোটিপতি নন, কিন্তু একেবারে পথের ভিখারীও নন। দিন যায়, অথচ শাহজাহাঁ পিতার জন্য কোন মক্‌বারা নির্মাণের আয়োজন করে না। আশঙ্কা হয় কোনদিনই সেটা বানাবে না শাহজাহাঁ। বাবুরের সমাধি আছে কাবুলে; হুমায়ুনের দিল্লিতে; আকবরের সেকেন্দ্রায়। বংশের চতুর্থ পুরুষ জাহাঙ্গীর বাদশাহর কোন সমাধিসৌধ থাকবে না? এটা কী হয়? বিগতভর্তা নূরজাহাঁ সম্রাটের কাছে আর্জি জানালেন, তিনি নিজ ব্যয়ে স্বামীর জন্য একটি মক্‌বারা বানাতে ইচ্ছুক। দিল্লি আগ্রা এলাকায় নয়; সুদূর পাঞ্জাবে। স্বচ্ছতোয়া রাভী নদীর কিনারে শাহ্‌দারায় নূরজাহাঁর স্ত্রীধন লব্ধ বিশাল ভূখণ্ডে। শাহ্‌জাহাঁ তখন তাজমহল বানাতে ব্যস্ত। এ আর্জির জবাব দেবার সময় নেই। অথচ সম্রাটের অনুমতি ভিন্ন এ কাজ সম্ভবপর নয়। অনেক অনুনয় বিনয়ের পরে, ক্রমাগত তাগাদা দেওয়ায় অবশেষে সম্রাটের তরফে নয়া উজীরে-আজম বিধবাকে অনুমতি দিলেন।

হুমায়ুন মক্‌বারাও নির্মিত হয়েছে তাঁর স্ত্রী হাজী বেগমের স্ত্রীধনে। কিন্তু তার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করেছিলেন হুমায়ুন-তনয় তরুণ আকবর। এবার তা হল না। শাহজাহাঁ শুধু অনুমতি দিয়েই খালাশ। এসবের ভিতর মাথা গলাবার সময় কই? তাজমহল নির্মাণ শুরু হয়ে গেছে যে। তাছাড়া দিল্লীতে নির্মিত হতে চলেছে ব্যয়বহুল লালকিল্লা।

নূরজাহাঁ তলব করলেন তাঁর পরিচিত স্থপতিকে—যার দক্ষ হাতের কাজ ইতমদ্‌উদ্দৌলা মক্‌বারা। লোকটার বয়স হয়েছে—পাঞ্জাবী মুসলমান। আহ্বান-মাত্র এসে হাজির হল। সঙ্গে তার তরুণ পুত্র। তাদের নাম অবশ্য ইতিহাসে

নেই—ইতিহাসের সেটা রেওয়াজই নয়। কে ডিজাইন করেছে কুৎবমিনারের বনিয়াদ, অথবা বুলন্দ-দরওয়াজার খিলান, কে ছিল পরিকল্পনাকার তাজমহলের—তাদের নাম ইতিহাস জানে না। কাহিনীর খাতিরে না হয় মেনে নেওয়া যাক—বৃদ্ধ স্থপতির নাম মীর্জা দাউদ্ লাহোরী।

নূরজাহাঁ তখন ষাটের ঘাটে। প্রথামাফিক ঝরোকার অন্তরাল থেকে যাবতীয় নির্দেশ দিলেন স্থপতিবিদকে। জানালেন, তাঁর মনোগত বাসনা। আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করল বৃদ্ধ স্থপতিবিদ। বললে, এ তো আমার গৌরব। শাহ্-য়েন-শাহ্ জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ গাজীর মক্‌বারা বানাবার মুবারকী লাভ করলাম। ওয়ার্ণা, আমি বৃদ্ধ, নিজে হাতে তো আর কাজ করতে পারি না বেগম-সাহেবা। আপনি মঞ্জুর করুন—আমার নির্দেশে মক্‌বারা বানাবে আমার তরুণ পুত্র। ওকে সব কিছু শিখিয়ে দেব, হুজুরাইন।

—কী নাম তোমার? —তরুণ স্থপতিকে প্রশ্ন করেন নূরজাহাঁ।

সতেজ শালচারা নত হল। কুর্নিশ করে বললে, মীর্জা ইস্‌মাইল লাহোরী, হুজুরাইন।

—আব্বাজানের সুনাম রাখতে পারবে তো?

—বেগম-সাহেবার মুবারকী থাকলে!

নূরজাহাঁ এতদিনে বৃদ্ধা।

হারেম-আব্রুতে দোপাট্টায় মুখ লুকিয়ে দিন গুজরান করছেন জাহান-এর নূর—জগতের আলো। সে মুখে এতদিনে পড়েছে বার্ধক্যের বলিরেখা। একুশ থেকে একান্ন—এই ত্রিশ বছরে তাঁর যতটা দৈহিক পরিবর্তন হয়েছিল তার চেয়ে বেশি হয়েছে এই কয় বছরে। ষোলশ' সাতাশ সালের আঠাশে অক্টোবরের পরে। খিদ্‌মৎগারেরা অনুপস্থিত, বাঁদির দল অপসৃত, যারা আছে তারাও কেয়ার করে না। খোজা প্রহরী আছে-কি-নেই। বেগম-সাহেবার মহল খাঁ-খাঁ করছে। সন্ধ্যায় চিরাগ জ্বালাতে মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায় খিদ্‌মৎগারের। তখন দেখা যায় পাষাণ অলিন্দে এক বৃদ্ধা মেহেজবীন তসবির-ছড়া হাতে নিয়ে নতনেত্রে পায়চারি করেন। মাঝে মাঝে তাঁর হাঁক শোনা যায়: কোই হ্যায়?

নূর-মহলের আর্ক-ক্রুতবে প্রতিধ্বনিত হয়ে শব্দটা ফিরে আসছে: হায়! হায়!

না। একজন তবু থাকে কাছে পিঠে। ছায়ার মতো। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের একটি বিধবা এসে দাঁড়ায় তার বালিকা কন্যার হাত ছাড়িয়ে: মা, ডাকছিলে?

থাকার মধ্যে এখনো আছে মীনা-বহিন। সেও প্রৌঢ়া। কি-জানি-কেন সে, আমাদের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ফিরোজাকে সেই মানুষ করছে; ঠিক আজি-আম্মা যেমন করত আমাকে। ফিরোজা কে? ও, সে-কথা বুঝি এখনো বলিনি? 'ন-সুদ্নি' শাহরিয়ারের স্মৃতিচিহ্ন। ফিরোজা এখন আর ঠিক বালিকা নয়। কিশোরী। মীনাবহিন তাকে বুকে আগলে রাখে। পুরানো-জমানার কিস্সা শোনায়। আর বলে, খুব হুঁশিয়ার, তোর বুড়ি দাদীর নজরে পড়ে যাস্ না যেন কোনদিন!

—কেন ফুফু? দাদীর নজরে পড়লে কী হয়?

—বুড়বক কাঁহিকা! বুঝিস্ না কেন? তোকে দেখলেই ওঁর মনে পড়ে যায় একটা পাপ কাজের কথা। আর তাছাড়া লাড্লি-বেগমের যে একটা বেদনাময় দাম্পত্যজীবন আছে এটা যে তিনি ভুলে থাকতেই চান! বুঝলি না?

ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি।

একদিন আম্মাজান আমাকে ডেকে বললেন, মুন্নি, এখানে আর সহ্য হয় না। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। চারিদিকে শুধু স্মৃতি, স্মৃতি আর স্মৃতিচিহ্ন। কিছুতেই নিজেকে ভুলতে পারছি না। তার চেয়ে চল, আমরা কজন মিলে শাহ্দারায় চলে যাই। তবু চোখের উপর দেখতে পাব ওঁর মক্বারা বানানো হচ্ছে। যাবি? তোর কী ইচ্ছে?

হাসিও পায়। যেন সারাজীবন আমার ইচ্ছানুসারেই সব কিছু হয়েছে। এমন কি নূরজাহাঁর কি একবারও মনে পড়েছিল—সেই সুদূর বুরহানপুরের এক অখ্যাত কবরখানায় পড়ে আছে জাহাঙ্গীরের আর এক পুত্রের উপেক্ষিত মৃতদেহ? নিজের স্বামীর মক্বারার একান্তে আর একটা সন্দোখ্ তৈরী করার নির্দেশ কি তিনি দিতে পারতেন না স্থপতিবিদকে? ওঁর আজীবন-সেবাদাসীর মরদের একটা কবর? ন-সুদনী শাহ্রিয়ারের?

কিন্তু না। সে-কথা আমি বলব না। ওঁর হাত থেকে কোন ভিক্ষা নিতে পারব না আমি?

—কই? কিছু বল্লি না, যে?

—এ তো ভালই। তাই চল।

বাদশাহ্র অনুমতি চাওয়া হল। অচিরেই এসে গেল তা। আমরা চারজন চলে এলুম পঞ্জাবে; আর কিছু দাসদাসী। শাহ্জাহাঁ তখন তাজমহল নিয়ে দারুণ ব্যস্ত। তার এসব ব্যাপারে খেয়ালই নেই।

কাটল আরও পাঁচটা বছর।

মেহেরউন্নিসা এখন সত্তর ছুঁই ছুঁই। ভুঁইয়ে-মুয়ে মুয়ে পড়ার জমানা। আমরা থাকতুম রাভী নদীর তীরে একটি কুটীরে। বিশ্বাস হচ্ছে না, নয়? কিন্তু সত্যই তাই। নুরজাহাঁর কুবেরের ভাণ্ডার এসে ঠেকেছে তলানিতে। নিজের বাসস্থান-বাবদে এর বেশি খরচ করার আর্থিক সামর্থ্য তাঁর নেই। পাথরের দেওয়াল, মুড়িয়া-টালির ছাউনি। চারখানা কামরা। একটা মায়ের, একটা আমাদের তিনজনের, বাকি দুখানা নানান কাজের। কুটীরের সামনেই একটা লম্বা বারান্দা। সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় নির্মীয়মাণ জাহাঙ্গীরী মকবারা। বিশ-পঞ্চাশজন মেহনতী মানুষ খাটছে। বেশি লোক লাগানো যায়নি। ধীরে ধীরে মাথা তুলছে প্রাসাদ। প্রথমে ছোট করেই বানানো হবে স্থির হয়েছিল; কিন্তু মন ভরল না প্রাক্তন ভারত-সাম্রাজ্ঞীর। বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত যে চৌহদ্দিটা তিনি অনুমোদন করলেন তার বিস্তার এক একদিকে দেড়-হাজার ফুট। জমিটা বর্গক্ষেত্র। সম্মুখে প্রকাণ্ড তোরণ। বিশাল ফুল-বাগিচা। বাবুরী 'চাহারবাগ্' নীতিতে বিভক্ত। প্রথমে চার টুকরো, তাদের প্রত্যেকটিকে বর্গক্ষেত্রের আকারে চার টুকরো। সবসমেত ষোলটি বাগিচা। মাঝখানে আবার বর্গক্ষেত্রের আকারে মূল মকবারা—এক-একদিক সওয়া তিনশ' ফুট লম্বা। সৌধের চারপ্রান্তে চারটি অষ্টভুজ মিনার—প্রায় শতফুট উচ্চতার।

তস্‌বি-ছড়া হাতে নিয়ে সারা দিনমান 'মেহেরউন্নিসা' বসে থাকেন ঐ বারান্দায়, একটা আরাম কেদারায়। এতদিনে তাঁর চুল ধব্‌ধবে সাদা; কিন্তু এখনও পিঠ ছাপিয়ে পড়ে। গাত্রবর্ম-বলরেখাঙ্কিত কিন্তু মেদ জমেনি শরীরে—এখনও তিনি সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন। কথা বলেন কম। চুপচাপ থাকতেই যেন ভালবাসেন। বাজনা আর বাজান না, ছবি আঁকাও ছেড়ে দিয়েছেন—চোখে বেদনা হয়; কিন্তু কবিতা লেখেন আজও। সৌখিনতার মধ্যে তাঁর সাবেকী মসীপাত্র, কলম আর সুদৃশ্য কাগজ।

মাঝে মাঝে নক্‌শা-হাতে এসে হাজির হয় তরুণ স্থপতি—মীর্জা ইস্‌মাইল। নানান রকম শলা-পরামর্শ চায়। নূরজাহাঁ শুধু ছবি আঁকতেই জানতেন না—এঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং দেখেও বুঝতে পেরেতেন। স্থাপত্য বিষয়েও তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল।

ইস্‌মাইল অনেকক্ষণ বক্‌বক্ করে হয়তো বাড়ির ভিতর দিকে তাকিয়ে বলে, আম্মাজান কোথায়? বড় পিপাসা লেগেছে।

আমাকেই খুঁজছে সে। তৃষ্ণার্ত শিল্পী। আমি ধড়মড়িয়ে উঠতে যাই। বৃদ্ধা মীনাবহিন আমার হাত চেপে ধরে। অবাক হয়ে বলি, ক্যা হুয়া?

—বুড়বক কাঁহিকা! রুখ্ যা!

বটেই তো! আমার এতদিন খেয়াল হয়নি। মীনাবহিনের চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। সে টের পেয়েছিল।

নজর হয়, এক হাতে কিছু মেওয়া-মেঠাই, আর হাতে পানির ভৃঙ্গার নিয়ে ফিরোজা তড়িঘড়ি এগিয়ে যায় বাইরের বারান্দার দিকে। তৃষ্ণার্তকে জলদান পুণ্য কাজ।

পরে এ নিয়ে মীনাবহিনের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। ও বলত, বেচারি ফিরোজা! পড়ে আছে এই বিজন বনে। ওর বয়সে আমাদের দিন কাটত নাচ্‌না-গানায়।

আমি বলতুম, আমি কিন্তু তোর মতটা জানতে পারছি না মীনাবহিন। আমাদের কৈশোর যেভাবে কেটেছে তার চেয়ে ফিরোজা অনেক আনন্দে আছে। এখানে অবরোধ নেই, রাস্তার ধারে গিয়ে পা-ছড়িয়ে বসে থাকলে নদীতে স্নান করলে কেউ বাধা দেবার নেই। কিন্তু আমাদের কী হাল ছিল, বল?

মীনা হঠাৎ কী ভেবে প্রশ্ন করে, হ্যাঁরে, রুস্তমের কথা তোর মনে পড়ে?

ঠিক ঐ কথাটাই তখন ভাবছিলুম বোধহয়। আমি রুখে উঠি, না! পড়ে না! সে কেন আমাকে লোভ দেখিয়ে ওভাবে পালিয়ে গেল? কেন আর কোনও খবর নিল না কোনদিন?

—ভুল করছিস্ লাডলি। হয়তো সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল তোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। মুঘল-হারামের দুর্ভেদ্য বেষ্টনী ভেদ করে আসতে পারেনি।

—আমি বিশ্বাস করি না! তার পক্ষে হারেমে আসা অসম্ভব হলেও আজিআম্মা কেন ফিরে এল না?

মা বলেছিল, সে কিছু মহামূল্যবান গহনাগাটি নিয়ে পালিয়েছিল—কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি, সেটা সত্য হতে পারে না। কারণ যার সম্পদ খোয়া গেছে সে কি তা টের পাবে না? কই কেউ তো কখনো বলেনি যে, গহনাগাটি খোয়া গেছে!

মীনা বলে, তখন বেগম-সাহেবের হেপাজতে যে পরিমাণ অলঙ্কার ছিল তাতে দু-দশ লক্ষ আসরফির গহনা খোয়া গেলেও তিনি টের পেতেন না।

—আমার তাও বিশ্বাস হয় না নূরজাহাঁর সে-আমলে খেয়াল থাকত কোন শতনরী মালায় কয়টা হীরকখণ্ড আছে! গহনা ছিল তার প্রাণ!

মীনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, পুরানো দিনের কথা থাক লাডলি। আগামীদিনের কথা ভাবতে শুরু কর এবার। ব্যাপারটাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না।

—ব্যাপারটাকে! কোন ব্যাপারটাকে?

—তুই কি কিছুই বুঝিস্ না? ফিরোজা আর ইস্‌মাইলের ঘনিষ্ঠতা।

—কেন? এতে দোষের কী আছে?

—বেগম-সাহেবা জানতে পারলে দুজনকেই কেটে ভাসিয়ে দেবে রাভীর জলে। মীর্জা ইস্‌মাইল মেহনতি মজদুর; আর খানদানি মুঘলাই খুন ফিরোজার ধমনীতে!

আমি রুখে উঠি, না! ফিরোজা জাহাঙ্গীরের নাতনি নয়! শের আফকন ছিলেন পারস্য রাজের সফরচি—প্রধান পাচক, নিতান্ত মেহনতি মজদুর!

হাসল মীনাবহিন। বললে, তাই বুঝি? তাহলে সেই শের-আফকনের একমাত্র কন্যা কেন হতে পারল না নিতান্ত সিপাহীর ঘরণী? যে সেপাই ছিল—রাজ্যহীন রাজার নাতি?

এ কথার জবাব নেই।

তা বটে! নূরজাহাঁ এ বিবাহ অনুমোদন করতে পারবে না। কিছুতেই নয়! ফিরোজের সঙ্গে তার দিদা-নাতনি সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়নি। কেন হয়নি বলা শক্ত। দুজনেই দুজনকে এড়িয়ে চলে, যেমন কিশোরী লাডলি এড়িয়ে চলত তার গর্ভধারিণীকে। কিন্তু নূরজাহাঁর খানদানি মেজাজটা আজও একইরকম। ফিরোজা আর ইস্‌মাইলের ঘনিষ্ঠতাটা যদি কোনদিন ওর নজরে পড়ে যায় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

স্থির করলাম ওদের দুজনকেই সাবধান করে দিতে হবে! সুযোগও হয়ে গেল একদিন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মেহনতী মানুষেরা ছুটি করেছে। মীর্জা ইস্‌মাইল এসেছে দিনান্তের হিসাব মাল্‌কিনকে বুঝিয়ে দিতে। ফিরে যাবার সময় সে একবার পিছন ফিরে কী যেন দেখল; তারপর চিনার গাছটার আড়ালে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখনই নজর হল—একটি নারীমূর্তি সন্ধ্যার 'ম্লানায়মান' অন্ধকারে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে ঐ চিনার গাছের দিকে। মেয়েটিকে চিনবার উপায় নেই। তার আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা। ফিরোজা রঙের বোরখা, পাড়ের কাছে রূপালী জরির ফ্রিল। পায়ে লাল নাগরাই, তাতে সোনালী জরির নক্‌শা।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল আমার।

তবু কর্তব্য যেটুকু তা করতেই হবে। নিঃশব্দচরণে আমিও এগিয়ে যাই। চিনার গাছের একদিকে আমি যে অত কাছে এগিয়ে এসেছি তা ওরা টের পায়নি। পাবে কোথা থেকে? তখন ওদের উত্তেজনা যে তুঙ্গে। আত্মপ্রকাশ করতে যাব, এমন সময় ঐ ছেলেটা এমন একটা মোক্ষম কথা বলে বসল যে, আমি

সঙ্কল্পচ্যুত হয়ে গেলুম। যা বলতে এসেছি তা বলা হল না। লজ্জায় মুখখানা যে কোথায় লুকাবো ভেবে পাই না।

পাগল শিল্পী! বদ্ধ উন্মাদ! না হলে কেমন করে অমন কথাটা বলল? ছি, ছি!

—তুমি তোমার মায়েব চেয়েও সুন্দর।

আমিও নিশ্চয়ই আমার মায়ের চেয়ে সুন্দরী ছিলুম না; তবু আর একটা পাগল ঠিক অমনিভাবে আর একদিন ·

ফিরোজাও তেমনি আমার চেয়ে সুন্দরী নয়। হতভাগ্যের আব্বাজান ছিলেন 'কোয়াসিমোদো'। কুৎসিত, কদাকার জড়ভরত। তুলনায় আমার আব্বাজান ছিলেন 'ইণ্ডিয়ান অ্যাপোলো'! কিন্তু 'রূপ' কি থাকে রূপসীর দেহে? যুগে যুগে তার আধখানা যে গচ্ছিৎ থাকে রূপদর্শীর চোখের তারায়।

আরও প্রায় মাসছয়েক পরের কথা।

প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে জাহাঙ্গীরী মক্‌বারার নির্মাণকার্য। সেদিন কী একটা উৎসব। ঈদুজ্জুহাই হবে হয় তো। মজদুরদের ছুটি। কাছেই কোথায় বুঝি একটা 'মেলা' বসেছে। ঢোল সহরৎ হয়েছে গাঁয়ে গাঁয়ে। ফিরোজা এসে বললে, যাবে আম্মা? মেলাতে দারুন দারুন খেলা এসেছে। নাগরদোলা, ভালুক নাচ, ভানুমতীর খেল, আরও কত কি? ইস্‌মাইল দেখে এসেছে। বললে, ভানুমতীর খেল্‌টা নাকি অবিশ্বাস্য! কী রকম জানো? যাদুকর একটা বাঁশি বাজায়; আর তার ঝাঁপি থেকে মোটা পাকানো শনের দড়িটা সাপের মতো হেল্‌তে দুল্‌তে মাথা তোলে। ধীরে ধীরে উঠে যায় আশ্‌মানের দিকে। উঠ্‌তে উঠ্‌তে এত উঁচুতে উঠে যায় যে, আর নজর চলে না। মিশে যায় মেঘের মধ্যে। তারপর নাকি সেই মাদারী...

আমি বাধা দিয়ে বলি, জানি। আগ্রাতেও সেই যাদুকর আসত।

—তুমি দেখেছ সেই খেলা?

দেখেছি কি? আবছা মনে পড়ে। হ্যাঁ, দেখেছি বোধহয়। যাদুকরের সঙ্গিনীর ভূমিকায় একবার সেই দড়ি বেয়ে আমি না উঠে গিয়েছিলুম বেহেস্তে? কী দেখেছিলুম সেখানে? ঠিক মনে নেই। আবছা স্মরণ হয়—একটা পদ্ম দিঘি শপ্‌লা ফুটে আছে—যাদুকর বললে, 'আমি সাঁতার জানি, তুলে এনে দেব?' ...তারপর? আমি বলেছিলুম—'মাদারী, বিশ্বাস কর, এই বাইশ বছর বয়সেও আমি জানি না...'

—কী? বল না মা? দেখেছ সেই খেলা?

নিজের অজান্তেই জিব দিয়ে অধরটা লেহন করি। যুগ-যুগান্তরের একটা স্বাদ। সামলে নিয়ে বলি, ইস্‌মাইলকে বল্ একটা গো-গাড়ির ব্যবস্থা করুক। তুই আর মীনাবহিন মেলা দেখে আয়—

—তুমি যাবে না?

—কেমন করে যাব, বল? আম্মাজানকে দেখ্‌ভাল করার জন্য একজনকে যে থাকতে হবেই।

—তবে আমি যেতে চাই না।

—না রে। পাগলামি করিস না। আজ তোরা তিনজনে দেখে আয়। কাল বরং মীনাবহিন থাকবে, আমি তুই আর ইস্‌মাইল যাব!

ফিরোজা নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে গেল ইস্‌মাইলকে খবরটা দিতে।

সেদিনই সন্ধ্যায় বাড়ি নির্জন হলে আম্মাজান আমাকে কাছে ডাকলো। ইদানিং আরও কাহিল হয়ে পড়েছে। বিছানা থেকে বাহিরের বারান্দাতেও উঠে আসতে পারে না। দিবারাত্র প্রায় শুয়েই থাকে। আমি গিয়ে ওর পায়ের কাছে বসলুম।

হঠাৎ কী ভাবান্তর হল। অনেকক্ষণ গায়ে মাথায় হাত বুলালো। যেন কী একটা কথা বল্‌তে চায়, অথচ সাহস সঞ্চয় করে উঠ্‌তে পারছে না। শেষে আমিই হেসে বলি, কী? কিছু একটা কথা বলবে বলে মনে হচ্ছে?

মা হাসল। তোবড়ানো দন্তহীন গালে টোল পড়ল। এখনও লজ্জা পেলে তার তোবড়ানো গাল দুটি পাকা-আপেলের মতো টুকটুকে হয়ে ওঠে। বল্‌লে, ঠিকই ধরেছিস্! একটা ভিক্ষা আছে। দিবি?

আমি অবাক। এ ভাষায় ও কোনদিন কথা বলেনি আমার সঙ্গে। বাদ্‌শাহ জাহাঙ্গীরের কাছেও সে কোনদিন ভিক্ষা চায়নি, হুকুম করেছে। এ আমি হলফ্ করে বলতে পারি! ওর এই উনসত্তর বছরের জীবনে একবার… হ্যাঁ, একবার আমি ওকে ভিক্ষা চাইতে দেখেছি: সেই খিদ্‌মৎ পার্স্ত খাঁর কাছে! শাহ্‌রিয়ারের জীবন ভিক্ষা! আর কখনও কারও কাছে…

ও নিজেই হেসে বলে, অবাক হয়ে গেছিস্, না রে? নূরজাহাঁ ভিক্ষা চাইছে!

আমিও হেসে বলি, তা একটু হয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—তুই ভুল করছিস্। নূরজাহাঁ ভিক্ষা চাইছে না। চাইছে মেহের, তোর মা!

—বেশ তো! বল না কী বলতে চাও? অদেয় হলে বাধা দেব কেন?

—সে জন্যই সঙ্কোচ হচ্ছে। যা চাইব তা যদি তোর অদেয় হয়?

রীতিমতো ঘাবড়ে যাই। এই বুড়ি বয়সে ও কি আমাকে আবার সংসারী করতে চায়?

একইভাবে বলতে থাকে, জীবনভর তুই আমার হুকুম তামিল করে গেছিস্। আজ এই শেষ-জমানায় কোন্ সরমে তোর কাছে ভিক্ষার ঝুলি পাতব? কিন্তু এটাই আমার শেষ ইচ্ছা, আখেরি আর্জি…

—বেশ তো, বল না! কী?

—আমি লক্ষ্য করেছি—ঐ মীর্জা ইস্‌মাইল আর দাদী, মানে ফিরোজের মধ্যে একটা মহব্বৎ পয়দা হয়েছে। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে। মানে, আমাদের জমানায় আমরা 'ইশ্‌ক্' বলতে, 'প্যার' বলতে যা বুঝতুম সে জাতের নয়। এ একটা…একটা বেহেস্তী মুবারকী! মীর্জা ইস্‌মাইল খানদানি ঘরের ছেলে নয়। কিন্তু সে শিল্পী! সে কবি! পাথরে কবিতা লেখে। এই আমার শেষ ভিক্ষা, মুন্নি! তুই অমত করিস্ না।

আমি আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলুম।

আম্মাজান ভুল বুঝল। আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে, সারাটা জীবন ভুল করে এসেছি রে! কিন্তু জানিস্ তো—আমি কবি! সব অহঙ্কার, সব আভিজাত্য ধুয়ে ফেলে এতদিনে আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়েছে। কাঁদিস্ না, মুন্নি। আমার কথাটা মেনে নে। দেখিস্, আখেরে ভাল হবে।

—তাই হবে মা! তুমি যখন চাইছ!

নিতান্ত অনাড়ম্বর বিবাহের আয়োজন হল।

আগ্রা থেকে সপরিবারে এসে হাজির হল মীর্জা ইস্‌মাইলের বাপ্। সে তো আনন্দে আত্মহারা। সাদি সমাপ্ত হলে ওরা স্বামী-স্ত্রী বৃদ্ধা দাদীর কাছে শ্রদ্ধা-প্রণাম জানাতে এল। নূরজাহাঁ ফিরোজকে বুকে টেনে নিয়ে বললে, ফিরোজ! আজ আনন্দের দিনে তোকে কী দেব আমি? আমি যে নিঃস্ব! একছড়া ঝুটো মুক্তোর মালাও যে তোর গলায় পরিয়ে দেব এমন সঙ্গতি নেই।

ইস্‌মাইল সালাম করে বললে, আপনার মুবারকীই আমাদের পাথেয় হবে দিদা। সেই আমার সারাহ্-খিলাৎ! শ্রেষ্ঠ পুরস্কার!

—হ্যাঁ; কিন্তু খালি হাতে আমি তো ফিরোজকে আশীর্বাদ করতে পারি না। এই নে। এটা যত্ন করে রাখ! সামান্য উপহার।

একখানা খাতা। প্রেমের কবিতায় ঠাসা। ফার্সিতে। নানান চিত্রশোভিত।

কবি নূরজাহাঁর স্বহস্তে লিখিত এবং স্বহস্তে চিত্রিত। তার অযৌবনের সঞ্চয়

পৃথিবীর অপরপান্তে একটি মহতী নগরী আছে, নাম শুনেছ? নাম: নিউইয়র্ক। সেখানে আছে একটি সংগ্রহশালা। তার নাম: স্মিথ্‌সোনিয়ান ইন্সট্যুট। যদি কখনও সেখানে যাও, দেখতে পাবে খাতাখানা। গাইডকে জিজ্ঞাসা কর, তার দাম কত?

সে বলবে, নিঃস্ব নূরজাহাঁর সেই আনমোল মুবারকীর দাম: সাত পয়জার!

মক্‌বারা নির্মাণের কাজ অতঃপর সমাপ্ত হল।

নূরজাহাঁ ততদিনে শয্যালীনা। চুল আঁচড়ে দিতে হয়, খাইয়ে দিতে হয়। পোশাক পরিয়ে দিতে হয়। উত্থানশক্তি রহিতা।

আগ্রা থেকে শাহ্‌-য়েন-শাহ্‌ জাহাঙ্গীরের মরদেহধারী কফিনটিকে এইবার স্থানান্তরিত করতে হয়। কিন্তু তার পূর্বে অনুমতি চাই বর্তমানে শাহ্‌-য়েন-শাহ্‌-এর। অনুমতি চেয়ে পত্রখানি আমিই রচনা করলুম। কম্পিত হস্তে তাতে স্বাক্ষর করে দিলেন সম্রাট জননী: নূরজাহাঁ-বেগম!

পত্রখানি নিয়ে মীর্জা ইস্‌মাইল স্বয়ং রওনা দিল আগ্রার দিকে।

সম্রাট অনুমতিদানের পূর্বে একজন বিশ্বস্ত উজীরকে সরেজমিনে তদন্ত করে আসতে বললেন—দেখে যেতে বললেন, নির্মিত মক্‌বারা সম্রাট জাহাঙ্গীরের উপযুক্ত হয়েছে কিনা।

উজীরে-আজমের তাঁবু পড়ল মক্‌বারা-চৌহদ্দিতে। তিনি তো আমাদের দীনের কুটিরে অতিথি হতে পারেন না—সেটা মুঘলাই 'খানদানিত্বে' বাধে! সপার্ষদ তিনি এসে উঠ্‌লেন তাঁবুতে। মীর্জা ইস্‌মাইল তাঁকে সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো। পরিদর্শন শেষ হলে উজিরে-আজম পদধূলি দিতে এলেন নূরজাহাঁর পর্ণকুটীরে। আমাদের সৌভাগ্য—তিনি অনুমোদন করেছেন।

কিন্তু।

হ্যাঁ, একটা ছোট্ট 'কিন্তু' আছে। যা আমাদের নাকি এতদিন খেয়াল হয়নি। অথচ নজর হয়েছে উজিরে-আজমের।

সবিনয়ে সেটা দাখিল করলেন উজিরে-আজম প্রাক্তন শাহ্‌-য়েন-শাহ্‌র শয্যালীন বিধবাকে।

—মাফি কিয়া যায়, বেগম-সাহেবা। থোড়া কুছ গলৎ তো হো গয়্যা!

গলৎ? কী গলৎ? আমরা রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করি।

—মক্‌বারাতে দেখলাম দুটি সন্দোখ্‌, দুটি কবর! তিনটে হওয়া উচিত ছিল না কি?

—তিনটি! কেন?—প্রশ্নটা আমিই পেশ করি। নূরজাহাঁ উপাধানে ভর দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় নির্নিমেষ-নয়নে তাকিয়েছিলেন শুধু। নির্বাক। নিস্পন্দ।

—সোচিয়ে লাডলি-বেগম-সাহেবা! একটা কবর তো প্রাক্তন শাহ্‌-য়েন, শাহ্‌ নূরউদ্দীন জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌ গাজীর। তার ঠিক পাশেরটা কালে হবে তাঁর সহধর্মিণীর, অর্থাৎ শাহ্‌-য়েন-শাহ্‌ শাহজাহাঁর গর্ভধারিণীর—আল্লাতালা তাঁর হাজার বরিষ পরমায়ু মঞ্জুর করুন…লেকিন, আপনার মায়ের যে শারীরিক অবস্থা—খোদা তাঁকে আরও লাখো বরিষ জিন্দা রাখুন—ওয়ার্ণা, ঔর এক সন্দোখ্‌…

বাক্যটা তিনি শেষ করেন না। নূরজাহাঁ তখনও পাথরে গড়া। চোখে পলক পর্যন্ত পড়ছে না। বজ্রাহত হয়ে গেলুম বরং আমরা!

মীনাবহিন আমার বাহুমূলে হাত রাখে। সম্বিত ফিরে পাই। আর্তকণ্ঠে বলি, কী বলতে চাইছেন উজীর-সাহেব? নিজের স্বাধীনে-নির্মিত মক্‌বারায় ঠাঁই হবে না জাহাঙ্গীর বাদ্‌শাহ্‌র প্রিয়তমা মহিষী নূরজাহাঁর?

বৃদ্ধ উজিরে-আজম তাঁর ফেনশুভ্র দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, আমি কিছুই বলছি না, মা। তবে সব কিছুই তো নিজের চোখে দেখছ: আমি বেগম-সাহেবার জমানার বান্দা—ওঁর কাছে নানাভাবে উপকৃত। তাই আমার মনে হল—কথাটা না জানালে আমার নিমকহারামী হবে।

বুঝতে পারি—যতই বিনয় প্রদর্শন করুন, এটা ঐ বৃদ্ধ উজিরের নিজস্ব বক্তব্য নয়। এই রকম নির্দেশ নিয়েই সে আগ্রা থেকে এসেছে। একমাত্র ঐ শর্তেই শাহ্‌জাহাঁ অনুমতি দেবে—তার পিতার মৃত্যুদেহ আগ্রা থেকে এই পঞ্জাবে স্থানান্তরিত করতে। যদি তার চক্ষুশূল বিমাতা স্বীকৃত হয়—জাহাঙ্গীরের পাশের কবরটি শাহ্‌জাহাঁর গর্ভধারিণীকে ছেড়ে দিতে। তাজমহল গড়তে বসে শাহ্‌জাহাঁ আজ অর্থকষ্টে পড়েছে। দুনিয়ার যেখান থেকে যত সংগ্রহ করা সম্ভব হীরা, মুক্তা, পান্না, লাপিস্‌ লাজুলি এনে সাজানো হচ্ছে মমতাজ মহলের মক্‌বারা। তার নিজের গর্ভধারিণীও অতি বৃদ্ধা—দেখ্‌-না-দেখ্‌ কবে ফৌত হবে। তার জন্য একটা মক্‌বারা বানাবার মেজাজ নেই—অথচ কোন একটা ব্যবস্থা না করলে সেটাও দৃষ্টিকটু। ফলে এটাই সবচেয়ে সহজ সমাধান। তাছাড়া ঐ চক্ষুশূল বিমাতা, একদিন যে খুররমকে বঞ্চিত করে খস্‌রৌ, জাহান্দার এমনকি ন-সুন্দনি শাহ্‌রিয়ারকে পর্যন্ত গদীতে বসাতে চেয়েছিল—

সেই হারামজাদিটাকে একটা আখেরি-চাবুকও মারা গেল!

দাঁতে দাঁতে চিপে বলি. উজিরে-আজম-সা'ব। আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি একটি বিকল্প প্রস্তাব রাখছি: এই সমাধিচত্বরেই আমি যদি আমার স্ত্রীধনে আমার মায়ের জন্য একটি ছোট্ট মকবারা বানাই—

—তুমি! তোমার আবার স্ত্রীধন কোথায়?

—ভুলে যাবেন না, উজির-সাহেব। আমিও বেহেস্ত্-আসীন জাহাঙ্গীর বাদশাহ্-র পুত্রবধূ!

—বহুৎ খুব! সে তোমার চিন্তা। তা যদি বানাতে পার তবে তো কথাই নেই। এই সমাধিচত্বরেই সেটা বানাতে পার। সম্রাটের তরফে আমি অগ্রিম মৌখিক অনুমতি দিয়ে যাচ্ছি। বানাও! মাতৃঋণ পরিশোধ কর। আগ্রাতে ফিরেই সম্রাটের লিখিত অনুমতিপত্র পাঠিয়ে দেব।

তখনো লালকিল্লার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়নি। শাহ্জাহাঁ থাকতেন আগ্রায়। নূরজাহাঁ এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেননি আদৌ। যেন মূক-বধির। অথবা মর্মরমূর্তি!

মাসখানেক পরে মীর্জা ইস্‌মাইল আমার কাছে দাখিল করল ঐ নয়া-মকবারার নকশা। ছোট্ট সমাধিসৌধ। জাহাঙ্গীরী সমাধি-চত্বরের একান্তে। নিরাভরণ—বিধবার উপযুক্ত মকবারা। নকশার আমি বুঝি কি ছাই? তাছাড়া মায়ের অনুমতিটা নিতেই হবে। তাই নকশাখানা নিয়ে ওঁর বিছানার পাশে গিয়ে বসি।

এক নজর দেখেই বললে, এ কী! তিন-তিনটে সন্দৌখ্ কেন?

—একটা তোমার, একটা তোমার মেয়ের, আর একটা তোমার জামাইয়ের।

—ও! তার মানে মাঝের এই জোড়া-সন্দৌখ্‌টা তোদের দুজনের। অন্তেবাসী কবরটা আমার?

—না! একান্তেরটা ফিরোজের বাপের। মাঝের দুটোই তোমার আমার। তাঁকে পেয়েছিলুম মাত্র সাতটা বছর। তার আগেও নয়, পরেও নয়। তাঁকে ছেড়ে আমি দিব্যি টিকে আছি। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যে কখনও থাকিনি, মা!

কোথাও কিছু নেই—বুকফাটা কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ে!

—কী হল? অমন করছ কেন? কী হয়েছে?

—পারব না, পারব না, কিছুতেই পারব না! এ শাস্তি তুই আমাকে দিসনে, মুন্নি! এ আমি সইতে পারব না!

—শাস্তি? কী শাস্তি?

—অনন্তকাল তোকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে শুয়ে থাকার শাস্তি!

মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ নাকি?

বললে, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়। আজ সব কথা তোকে খুলে বলব। আর এ পাষাণভার একা-একা বইতে পারছি না। সব কথা শুনেও যদি···

গৃহদ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে এসে বসলুম। মাথার বালিশটা ঠিক করে দিয়ে।

খোলা জানলা দিয়ে অস্তমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত। কাঁক-কাঁক ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল এক ঝাঁক ঘরে-ফেরা মরাল-হাঁস। বহুদূর দিয়ে একটা গো-গাড়ি চলেছে কোথায়। তার তৈলতৃষিত চাকা-জোড়া বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। যেন অনেক দূর থেকে প্রশ্ন করল, হ্যাঁরে, আজি-আম্মাকে মনে আছে তোর?

জবাব দিইনি। জবাবের প্রত্যাশায় প্রশ্নটা সে পেশ করেনি। একটু নীরব থেকে আবার একটা প্রশ্ন করে, আর মনে আছে তোর? আগ্রা কিল্লার জাহাঙ্গীরী মহলের দক্ষিণে একটা বকুলগাছ ছিল?

এবারও জবাব দিইনি। ও প্রশ্ন করছে নিজেকে। স্মৃতিটুকু ঝালিয়ে নিচ্ছে।

—আজি-আম্মা নিরুদ্দেশ হয়নি। সে শুয়ে আছে ঐ বকুলগাছের তলায়। একা নয়···অনন্তকাল ধরে সে শুয়ে থাকবে তার একমাত্র সন্তানকে বুকে জড়িয়ে; ঠিক তুই এখনই যেমন···

নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় ঘটনাটা বিবৃত করল মৃত্যুপথযাত্রী নূরজাহাঁ।

আজি-আম্মার আশঙ্কা ছিল—পরদিন সকালেই আমরা ধরা পড়ে যাব। সেকথা সে-রাত্রে আমরা আলোচনাও করেছিলুম। ও আমাকে আশ্বস্ত করেছিল—উপযুক্ত ব্যবস্থা সে নেবে। নিয়েছিল। কিন্তু ব্যবস্থাটা কার্যকরী হয় নি।

আমি অতটা মরিয়া হইনি। শাহ্‌জাদা শাহ্‌রিয়ারের সঙ্গে সাদি স্থির হলো। অনিবার্য নিয়তির নির্দেশ হিসাবে মেনে নিয়েছিলুম ভাগ্যকে। আজি-আম্মা পারেনি। তার বুকের দুধ খাওয়া দুটি সন্তানকে সে এভাবে বলি দিতে রাজি হতে পারেনি—এক আকাশচুম্বী ক্ষমতালিপ্সুর যূপকাষ্ঠে! সে জানত—ফতেপুর-সিক্রি থেকে আগ্রা ফেরার পথে রুস্তমের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছিল—জানতো, আমাদের বাল্যপ্রেম নতুন করে ঝালিয়ে নিয়েছিলুম আমরা সেই অবাক সন্ধ্যায়। রুস্তম্ কথা বলত কম—কিন্তু এ ব্যাপারে, পারলে একা মা-ই তাকে সাহায্য করতে পারত। তাই সব কথা সে খুলে বলেছিল তার মাকে।

আমি কিছুই বলিনি ; কিন্তু লাডলী-বেগম সদ্যোজাত অবস্থা থেকে তার হাতেই পূর্ণযুবতী হয়েছে। ও কিছুতেই স্বীকৃত হতে পারেনি নূরজাহাঁর ঘৃণিত প্রস্তাবে—তার আদরের লাডলীকে একটা জড়ভরত পঙ্গু মানুষের নুলো হাতে তুলে দিতে। তাই একটা অদ্ভুত পরিকল্পনা করে। আজি-আম্মা জানত—প্রতিদিন মধ্যরাত্রে টল্‌তে টল্‌তে শাহ্‌-য়েন-শাহ্‌ জাহাঙ্গীর নূরজাহাঁর শয়নকক্ষে আসেন। দেহরক্ষী তাঁকে পৌছে দিয়ে রুদ্ধদ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করে। আজি-আম্মা তখন শুরু করে তার নিত্যকর্মপদ্ধতি। বাদ্‌শাহ্‌র পোশাক খুলে দেয়, বসিয়ে দেয় পালঙ্কে। বাদ্‌শাহ্‌ তাঁর পেয়ারের বেগমের সঙ্গে নৈশাহারটা ওখানেই সারেন। এবং পুনরায় দু-এক পাত্র মদ্য। আজি-আম্মাই যাবতীয় ব্যবস্থা করে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত সে। বাদ্‌শাহ্‌র আহার্য বেগমের খানা-কামরায় পৌছিয়ে দিয়ে খিদ্‌মৎগার প্রতিটি পাত্র থেকে সামান্য দু-এক টুকরো তুলে মুখে দেয়। আজি-আম্মার উপস্থিতিতে এবং আহারান্তে তাকে বসে থাকতে হয়, সম্মুখের অলিন্দে। জিম্বাদারী ঐ আজি-আম্মার—পরখ্‌ করে দেখে নেওয়া যে, বাদশাহ্‌-বেগমের আহার্যে কোন বিষ মিশ্রিত হয়নি।

সেই সুযোগটাই নিতে চেয়েছিল। যে রাত্রে আমার নিরুদ্দেশ হবার কথা সেই রাত্রে প্রহরীবেষ্টিত সফরচি পৌছে দিল বাদশাহ্‌-বেগমের নৈশাহার। আহার্য গরম রাখার সামোভার ঘরেই থাকে। খানা মুখে দিয়ে সফরচি প্রমাণ দিল ওতে বিষ মেশানো হয়নি। লোকটা ঘর ছেড়ে যেতেই নির্জনতার সুযোগে দুই পাত্রেই তীব্র বিষ মিশ্রিত করে আজি-আম্মা আমাকে মাঝরাত্রে ঘুম থেকে ওঠাতে এসেছিল। সে জানত—রাত্রি-প্রভাতে আমাদের নৌকা যখন বিশ-ত্রিশ মাইল দূরে তখন আবিষ্কৃত হবে নৃশংস ব্যাপারটা। আগ্রা-কিল্লায় ঘটবে একটা বিস্ফোরণ—ধীরে ধীরে তার প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়বে গোটা হিন্দুস্তানে, দাক্ষিণাত্যে, পারস্যে। রাতারাতি বিষপ্রয়োগে নিহত হয়েছেন শাহ্‌-য়েন-শাহ জাহাঙ্গীর এবং তার ভুবন-মোহিনী পেয়ারী বেগম নূরজাহাঁ! আজি-আম্মা এ-কথাও আন্দাজ করেছিল—সবার আগে ছুটে আসবে করিৎকর্মা শাহ্‌জাদা খুররম। অতি ব্যস্ত হয়ে উঠবে। বাদ্‌শাহকে গোর দেওয়া, অভিষেক, সিংহাসনের অন্যান্য দাবীদারদের রোখা। হয়তো বাহ্যিক শোক প্রকাশের অবকাশে মনে মনে খুশিই হবে সে। অজ্ঞাতপরিচয় হসীসিয়ুনের প্রতি—যে লোকটা তার বাদশাহীকে দু কদম এগিয়ে নিয়ে এল। হয়তো ইতিহাসে লেখা থাকবে—শেষ রাত্রে অম্লশূলের তীব্র আক্রমণে প্রাণত্যাগ করেছেন খস্‌রৌর পিতা এবং বিরহযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা

করেছেন তাঁর বেগম! মোট কথা আগ্রা কিল্লা থেকে একটি নগণ্য বালিকা যে গুণতিতে কম পড়ছে এটা খেয়ালই হবে না কারও।

সব ব্যবস্থাই সে করেছিল সুচারুভাবে, শুধু একটা কথা তার খেয়াল হয়নি। তামাম হিন্দুস্তানের দাবার ছকে প্রতিটি বড়ের গতিবিধি যার নখদর্পণে সেই নূরজাহাঁর মাথার পিছনেও দুটি চোখ ছিল!

সমস্ত নারকীয় ষড়যন্ত্রটা জানতে পেরেছিল সে।

আজ্জি-আম্মা খাদ্যে তীব্র বিষ মিশিয়ে যখন আমার পলায়ন পর্যায়ের ইন্তেজামে ব্যস্ত, তখন সে ডেকে পাঠিয়েছিল সিপাহশালার আসফ খাঁ-র বাহিনীর এক সামান্য সৈনিককে। বোধকরি সেও ছিল ব্যস্ত, উত্তেজিত—কোথায় যেন যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। স্বয়ং ভারতেশ্বরী অবিলম্বে তাকে দেখা করবার নির্দেশ জারী করেছেন শুনে তার মুখ শুকালো। তবে কি সব জানাজানি হয়ে গেছে! না, তা নয়, তাহলে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তাকে কারাগারে নিয়ে যেত ওরা—এভাবে নূরজাহাঁর খাস্ কামরায় নয়। দুরু দুরু বক্ষে সে প্রহরীর সঙ্গে এসেছিল আগ্রা কিল্লায়। তার উপস্থিতির কথা ঘোষণা করে প্রহরী যখন কুর্নিশ করতে করতে পিছু হটে মিলিয়ে গেল তখন দুলে উঠল বেগম-সাহেবার গৃহদ্বারের পর্দা। সুন্দরী এক বাঁদী আগন্তুককে আহ্বান জানালো, আপ্ ভিতর আইয়ে, বৈঠিয়ে।

বেগম-সাহেবার খাস্ কামরায় প্রবেশের আগে নিরস্ত্র হতে হয়। দ্বাররক্ষক এগিয়ে এসে রুস্তমের কটিদেশ থেকে তলোয়ারসমেত কোমরবন্দটা খুলবার উপক্রম করতেই বাঁদী বলল, রাহ্‌নে দিজিয়ে।

দ্বাররক্ষকের বিস্মিত দৃষ্টির বিনিময়ে জানালো, বেগম-সাহেবা কী হুকুম!

ওর হবু-শ্বশুর যেমন একদিন নিশ্চিন্ত-মনে সশস্ত্র প্রবেশ করেছিলেন কুতুব-উদ্দীন কোকার কক্ষে, ঠিক তেমনি রুস্তম ঢুকল বেগম-সাহেবার শয়নকক্ষে। বাল্যকালে সে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে নূরজাহাঁকে—না! তাঁর দর্পণ-প্রতিবিম্ব শের আকবর-ঘরণী মেহেরুন্নিসাকে। আগ্রাতেও দেখেছে, প্রকাশ্য দরবারে—যদিও চিকের আড়ালে, অস্পষ্ট আভাসে।

সেই সালঙ্কার মদিরাক্ষী ভুবনমোহিনীর আবির্ভাবে রুস্তম মাজা-ভেঙে বারবার তিনবার কুর্নিশ করল।

আশ্চর্য! অপরিসীম আশ্চর্য! বেগম-সাহেবা গাত্রস্পর্শ করলেন ওর। শিহরিত হল রুস্তম খাঁ। নূরজাহাঁ অগ্রসর হয়ে এসে নিজের চম্পকাঙ্গুলিতে গ্রহণ করলেন ওর বজ্রমুষ্টি। যেন বীণায় ঝংকার: পাগল কাঁহাকা! বুদ্ধক

তুমি শোননি নূরজাহাঁ গান গায়, ছবি আঁকে, কবিতা লেখে? সে কবি?

রুস্তমের মনে হল, সে স্বপ্ন দেখছে! মধ্যরাত্রে এ কী জাতের সম্ভাষণ!

—শোননি, তার বাল্যপ্রেমের কথা? এমন বেহেস্ত-ই-মহব্বতের মূল্য সে দেবে না? আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সাদি দেব তোমাদের! লায়লা-মজনু! লাডলী-রুস্তম!

রুস্তম বজ্রাহত হয়ে গেল। তার দুটি চোখে জল ভরে এল।

সম্রাটের যে আহার্যদ্রব্য কাঠ-কয়লার কাংড়িতে ওমে রাখা ছিল সেটি পরিপাটি করে সাজিয়ে স্বহস্তে বাড়িয়ে ধরল নূরজাহাঁ। বললে, রাতের আহারটা ততক্ষণে সেরে নাও—ওকে ডেকে পাঠাই।

করতালি-ধ্বনি করে নূরজাহাঁ। তৎক্ষণাৎ খাস্‌বাঁদী এসে কুর্নিশ করে হাজিরা দেয়।

—লাড্‌লী-বেগম সাহেবাকো সেলাম দো।

পিছু হেঁটে বাঁদী নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। তাকে পূর্বসঙ্কেত জানানোই ছিল। সে জানত, এবার ডেকে আনতে হবে আজি-আম্মাকে, লাডলী-বেগমকে নয়। আজি-আম্মা কখন কোথায় আছে, কী করছে, সব তার জানা; কারণ তার পিছনে সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল একটি গুপ্তচর।

আজি-আম্মা যখন প্রদীপ-নেবা অন্ধকারে আমাকে রুস্তমের শেরওয়ানি-চোস্ত-এ সাজিয়ে দিচ্ছিল, তখন সেই গুপ্তচর নীরন্ধ্র অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল অদূরে, আর তখন নূরজাহাঁর খাস্‌-কামরায় পাষাণ-চত্বরের উপর উবুড় হয়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে রুস্তম। বাদশাহ্‌র-নৈশাহারে আপ্যায়িত হয়ে।

আমি 'মুসম্মান বুর্জ'-এর সিঁড়ি বেয়ে ছাদের দিকে উঠে যাবার পর সেই গোপন স্থান থেকে বার হয়ে এল গুপ্তচর। আজি-আম্মাকে জানালো—বেগম-সাহেবা তাকে তলব করেছেন। তৎক্ষণাৎ!

আর আমি যখন মুসম্মান-বুর্জ-এর চবুতরায় রাত্রি প্রভাতের প্রতীক্ষায় বসে আছি—যমুনার তীরবর্তী জঙ্গল থেকে আলোর সঙ্কেতের ব্যর্থ প্রত্যাশায় প্রহর গুণছি তখন একমাত্র সন্তান-ক্রোড়ে নূরজাহাঁর খাস্‌-কামরায় পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে মেহেরউন্নিসার আকৈশোরের বিশ্বস্ত বাঁদী: আজি-আম্মা।

মৃতপুত্রকে কোলে নিয়ে বেগম-সাহেবার নৈশাহারটা ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল হতভাগিনী!

রাত্রি-প্রভাতের পূর্বেই নূরজাহাঁ-মহলের অদূরে, দক্ষিণ দিকে বকুল গাছতলায় কবরস্থ করা হল মাতা-পুত্রের মৃতদেহ। আজি-আম্মার আঙরাখা

থেকে পাঞ্জাছাপখানি সরিয়ে রেখেছিল নূরজাহাঁ। তারই হুকুমে অমরসিং দরওয়াজার প্রহরী রটনা করে সপুত্র আজি-আম্মার পলায়ন কাহিনী।

ধীরে ধীরে সব কিছু বলে যেন সম্বিত ফিরে পায় মৃত্যুপথযাত্রিণী। যেন হঠাৎ ফিরে আসে বর্তমানে। বিষের মতো নীল দুটি চোখ আমার মুখের সামনে মেলে ধরে ভাঙা গলায় প্রশ্ন করে, তুই কি পারবি? আমার বুকের কাছে অনন্তকাল শুয়ে থাকতে? না, রে! পারবি না! ঐ একান্তের দলছুট সন্দৌখ্‌টাই বরং আমার!

আমার কাহিনী শেষ হয়েছে।

ঠিকই বলেছিল নূরজাহাঁ—এ অপরাধ ক্ষমা করা যায় না! কিন্তু করেছিলুম। কার উপর প্রতিশোধ নেব? ঐ মৃত্যুপথযাত্রিণী অভাগিনীর উপর? অসহায়া, অন্তেবাসিনী বিধবার উপরে? যার দক্ষিণ-অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। আমি হাতে তুলে খাবার খাইয়ে না দিলে যে অনাহারে মরবে! মরে শান্তি পাবে?

পঞ্জাবের শাহ্‌দারায় যদি কখনো যান, দেখতে পাবেন রাভী নদীর তীরে জাহাঙ্গীরী-মক্‌বারা। ইতমদ্‌উল্লৌলার সমাধিসৌধের মতো তার খিলানে খিলানে নেই পিটা-ডুরার খিল্‌খিলানি—আসবপাত্র, ভৃঙ্গার, চষক! নিতান্ত নিরাভরণ পাষাণ ঘেরা সমাধিমন্দির। কারুকার্যের চিহ্নমাত্র নেই।

আর সেই সমাধিচত্বরের একান্তে, নজর করলে দেখতে পাবেন ছোট্ট একটি মক্‌বারা। চিনার গাছটার তলায়। যে চিনারগাছের আড়ালে ইস্‌মাইল ফিরোজাকে একদিন বলেছিল, 'তুমি তোমার মায়ের চেয়েও সুন্দর'!

হয়তো এখন সে গাছটাও নেই। তিনশ বছর পার হয়ে গেছে তো! তা না থাক, কিন্তু কবর তিনটি আছে; মর্মর দিয়ে বাঁধানো তিন তিনটি সন্দৌখ্‌ও।

গাইডকে জিজ্ঞাসা করবেন; সে চিনিয়ে দেবে—

পুবদিকের, মানে রাভী নদীর কিনার ঘেঁষে ঐ বড় কবরটির তলায় শুয়ে আছেন জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌র কনিষ্ঠপুত্র শাহ্‌জাদা শাহরিয়ার—যে প্রাণ দিয়ে প্রমাণ রেখে গেছে যে, সে 'ন-সুদ্‌নি' ছিল না।

আর ঐ যে ছোট্ট আট-হাত বাই আট-হাত ঘরখানা—ওর মাঝামাঝি দুটি কবর দেখতে পাচ্ছেন? ও-দুটি মা-মেয়ের। যে মাকে ছেড়ে মেয়ে কোনদিন দূরে যায়নি; যে মেয়েকে সারাটা জীবন আগ্‌লে রেখেছিল তার মা—বিচিত্রবর্ণা দুর্লভ বামাবর্ত শঙ্খের মতো। ওরা দুজন জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে, শুয়ে থাকবে অনন্তকাল।

আর সেই জোড়া-কবরের পাষাণ ফলকে উৎকীর্ণ করা আছে অনবদ্য একটি ফার্সি বয়েৎ।

তাঁর স্বরচিত কবিতা। লেখিকা ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহাঁ নয়, ইতমদ্‌উদ্দৌলার গরবিনী আত্মজা মেহেরউন্নিসা নয়, এমনকি নয় বর্ধমান-দেহলীর কোন কুলবধূ, শের আফকনের ঘরণী।

সে একনৈর্ব্যক্তিক, স্পর্শকাতরা বেদনা-বিধূর শাশ্বত কবি-আত্মার আর্তি :

"বর্‌ মজার-ই-মপ্‌ ঘরীবান্‌ নই চিরাগী নই ঘুলী
নই পর-ই-পরোয়ানা সুজদ নই সদা-ই-বুল্‌বুলি ॥"

আর এক স্পর্শকাতর, বেদনাবিধূর কবি-আত্মার দরদী অনুবাদে যা : [20]

"গরীব-গোরে দীপ জ্বেল না, দিও না কেউ ফুল ভুলে।
শ্যামাপোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুলবুলে ॥"

* * *

লাড্‌লী বেগম-সাহেবা—তাঁর লাখো-বরিষ বেহেস্ত্‌বাস মঞ্জুর হোক—তাঁর জবানবন্দি শেষ করেছেন আগের অনুচ্ছেদে। এরপর যে অনুচ্ছেদটি যুক্ত করছি সেটা তাঁর জবানবন্দি নয়; সেটা এই অধম বান্দা—এ-গ্রন্থের লেখকের আখেরি তামাম শুদ্‌ উপসংহার :

লাড্‌লী ক্ষমা করতে পেরেছিলেন তাঁর গর্ভধারিণীকে। ভারতেশ্বরী নূরজাহাঁকে—যে নূরজাহাঁর জন্ম শের আফকনের মৃত্যুতে, যাঁর মৃত্যু জাহাঙ্গীরের দেহাবসানে। মেহেজবীন নূরজাহাঁর দেহ অবশ্য সমাধিস্থ হয়েছিল অনেক পরে, —1645 খ্রীষ্টাব্দে; ঐ রাভী নদীতীরের চিহ্নিত কবরে। লাডলীর তত্ত্বাবধানে। মীনাবহিন—তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র না হলেও অধম লেখকের কল্পনায় বেঁচেছিলেন আরও পাঁচ বছর। অর্থাৎ হিসাব মতো যে বৎসর দিল্লিতে মহা আড়ম্বরে লালকিল্লার উদ্বোধন হল; হিন্দুস্তানের রাজধানী অপসারিত হল আগ্রা থেকে দিল্লীতে।

লাড্‌লী তারপর একাই থাকতেন ঐ পর্ণকুটীরে।

একাই। কারণ ইস্‌মাইল ভালো কাজের বায়না পেয়ে সস্ত্রীক চলে গেছিল কাবুলে। ফিরোজার আপত্তি ছিল মাকে ছেড়ে যেতে; কিন্তু লাড্‌লীই জোর করে ওদের পাঠিয়ে দেন। এরপর আরও সাত-আট বছর ঐ নির্জন কুটীরে বেঁচে ছিলেন লাড্‌লী; দিনান্তে চিরাগ জ্বেলে দিয়ে আসতেন মায়ের কবরে। সম্রাট শাহ্‌জাহাঁর কাছে তিনি একটি সনির্বন্ধ আর্জি পাঠিয়ে দেন—অনুমতি

ভিক্ষা করে, যাতে বুরহানপুর থেকে শাহ্‌দারায় আনতে দেওয়া হয় তাঁর স্বামীর—শাহ্‌জাদা শাহ্‌রিয়ারের মৃতদেহ। তাঁর আশা ছিল সম্রাট বিধবার এই সামান্য অনুরোধটুকু রাখবেন। তাঁর সে আশা পূরণ হয়নি। এজন্য অহেতুক দোষ দেবেন না শাহ্‌জাহাঁকে। একান্তবাসিনী লাড্‌লী না জানলেও আমরা জানি 1658 খ্রীষ্টাব্দের পর বিধবার ঐ সামান্য অনুরোধটুকু রক্ষা করার মতো ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিল না ভারতেশ্বর শাহ্‌জাহাঁর। কারণ তিনি তখন আর দিল্লীর লালকিল্লায় নেই; আছেন আগ্রা কিল্লায়। বন্দী হিসাবে। শাহ্‌জাহাঁর অন্যান্য পুত্ররা দারা-সুজা-মুরাদ রওনা হয়ে গেছে খুররমের ভ্রাতৃবৃন্দের ইতিহাসচিহ্নিত পথরেখা ধরে। শাহ্‌-য়েন-শাহ শাহ্‌জাহাঁর অত সাধের ময়ূর-সিংহাসনে উঠে বসেছে বাপ্‌কে-টেক্কা-দেওয়া অপশাসক: আলমগীর।

রাভী নদীর তীরে অন্তেবাসিনী বিগতভর্তার কাছে এসব সংবাদ আদৌ পৌঁছায়নি।

লাডলী মারা গেলেন 1659 খ্রীষ্টাব্দে।

জিন্দা ঔরৎ-এর মর্যাদা না দিলেও মুর্দাকে যথোচিত সম্মান জানানোর আদব ছিল মুঘল-জমানায়। তাই শাহ্‌দারার নির্জন কুটীরে এক অন্তেবাসিনীর মৃত্যু হয়েছে সংবাদ পেয়ে ছুটে এল পঞ্জাবের শাসনকর্তা। মৃতা নাকি সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্রবধূ! মুঘল-হারেমের অতি সম্মানীয়া মুর্দা। বিধবার যাবতীয় বাকসো-প্যাটরা মাদুর-বিছানা সমেত মৃতদেহটি কাফিনবদ্ধ করে সুদূর দিল্লীতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল সে।

যথাসময়ে তা উপনীত হল লালকিল্লায়।

লাহোর দরওয়াজায় শোকযাত্রা উপস্থিত হতেই প্রহরী পুকার দেয়: রুখ যাও! কীসের শোকযাত্রা? কার মৃতদেহ নিয়ে এসেছ তোমরা?

—ইমান ইন্‌সাফের প্রাক্তন-মালিক নূরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌ গাজীর কনিষ্ঠ পুত্রবধূ—বেহেস্ত্‌-আসীন শাহ্‌জাদা শাহ্‌রিয়ারের ধর্মপত্নী লাডলী বেগম-সাহেবার।

তৎক্ষণাৎ নক্‌করখানায় দুন্দুভির নিনাদ শোনা গেল!

সব বৃত্তান্ত শ্রবণ করে নয়া শাহ্‌-য়েন-শাহ্‌ আলমগীর বাদশাহ্‌ ফতোয়া জারী করলেন—ঐ বুড়িটা মুঘল বংশের কেউ নয়। নূরজাহাঁ যে আসলে মেহেরউন্নিসা তখন ওর জন্ম। ওর দেহে মুঘল-রক্ত নেই। মুর্দাকে যেখানে ইচ্ছা কবরস্থ করতে পার তোমরা।

আমীর ওমরাহ্‌রা নিজেদের বুদ্ধিমত একটা সিদ্ধান্তে এল।

এটাই মুঘলকাব্যে উপেক্ষিতা লাড্‌লী-বেগমের জীবনের শেষ ট্র্যাজেডি।

সান্ত্বনা এটুকু যে, হতভাগিনী এই ভাগ্যের পরিহাসটা জেনে যায়নি। তাই তার জবানবন্দিতে এই শেষ ট্র্যাজেডির উল্লেখ নেই।

এমনকি এখনো অনেক ঐতিহাসিক ঐ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী:

"লাহোরের···শাহ্‌দারায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধিভবনের কাছেই আর একটি সমাধিভবন - বাহুল্যবর্জিত, নিরাভরণ, সাধারণ, কালের প্রকোপে জীর্ণ। তার মধ্যে একটি নয়, পাশাপাশি দুটি কবর—মা আর মেয়ে—নূরজাহাঁ আর লাডলী বেগম।"[21]

শাহ্‌দারায় আমি যাইনি। গেলে নিশ্চয় দুটি কবরই দেখতাম — কিম্বা কে-জানে নদীর কিনারে সেই ভাঙাচোরা তৃতীয় কবরটিকেও—যেটি শাহ্‌রিয়ারের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু কেমন করে বোঝা যাবে — কার নিচে কে আছেন? নূরজাহাঁর সমাধি যে কেন্দ্রীয় কবরটি, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর লেখা কবিতাটিও আছে। কিন্তু শাহ্‌রিয়ারের মৃতদেহ শাহ্‌দারায় নেই। আজও অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে কাঁটা-গুল্ম-আকীর্ণ বুরহানপুর কিল্লা-চত্বরে।

মধ্যপ্রদেশে বুরহানপুর কিল্লা। জলগাওঁ থেকে প্রায় একশ কি. মি. দূরে। গাইডকে প্রশ্ন করেছিলাম, শাহ্‌জাদা শাহ্‌রিয়ারের কবর কোনটা?

লোকটা অবাক হল। জানতে চায়: বহ্‌ কৌন থা? ম্যয়নে জিন্দেগীভর উন্‌কো নামই নহি শুনা!

আগ্রায় ইতমদ্‌উদ্দৌলায় আমাকে গাইড মীর্জা গিয়াস আর আসরফ বেগমের অর্থাৎ নূরজাহাঁর পিতামাতার কবর দেখাবার পর দেখিয়েছিল আরও একটি কবর। বললে, এইটি নূরজাহাঁর একমাত্র কন্যা লাডলী-বেগমের। আমি চমকে উঠেছিলুম: সে কি। তাঁর কবর তো পাঞ্জাবে, শাহদারায়?

—নহী বাবুজী! ইয়েই হ্যায় লাডলী-বেগম-সাহেবাকি কব্বর।

পুরাতত্ত্ব বিভাগে খোঁজ নিয়ে যেটুকু জেনেছি তাতে মনে হয় গাইড আমাকে ঠিকই বলেছিল।

আলমগীর হাত ধুয়ে ফেলার পরে আমীর ওমরাহ্‌রা নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা-মতো ঐ লা-মুঘল বে-ওয়ারিশ ঔরতের মুর্দাটিকে শুইয়ে দিয়েছিল তার দাদামশাই দিদিমার কোলঘেঁষে।[22]

সেটাই লাডলীর জীবনে 'আখেরি আঁসু'—সান্ত্বনা এটুকুই যে, সে কথা ও হতভাগিনী জেনে যায়নি।

জেনে যায়নি তার জীবনের 'আখেরি হাস্'-এর কৌতুকটুকুও!

ওর বাক্স-প্যাটরার ভিতর থেকে পাওয়া গেছিল অদ্ভুত দর্শন একটা ডুগডুগি। স্রিফ বান্দর-খিলাওনকে লিয়ে। ওয়ার্না—মণিমুক্তাখচিত মহা মূল্যবান বস্তু! একজন বৃদ্ধ সভাসদ বস্তুটা সনাক্ত করল। বললে, এটি ঐ লাড্‌লী বেগমসাহেবাকে উপহার দিয়েছিলেন শাহ্‌জাদা খুররম্। সে বহুৎ বহুৎ যুগ আগেকার কথা!

শুনে বাদশাহ্ আলমগীর ফতোয়া জারী করেছিলেন—তাহলে ওটা আগ্রায় পাঠিয়ে দাও। যার ধন তার কাছেই ফিরে যাক।

নূরজাহাঁকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিল লাডলী। বলেছিল, ভাগ্যবিড়ম্বিতকে কৌতুক করতে নেই! কিন্তু মহাকালকে ধমকে থামিয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল না খস্রোর আশীর্বাদধন্যা লাডলী-বেগমের!

নয়া-সম্রাটের আদেশে যার ধন তার কাছেই ফেরৎ গেল:

মহাকালের সেও এক নিষ্ঠুর কৌতুক।

আগ্রা কিল্লার বন্দিশালায় এত-এত দিন পরে সেই সোনা-মোড়া ডুগডুগিটা ফেরত পেয়ে প্রাক্তন শাহ্-য়েন-শাহ্ শাহ্‌জাহাঁ চিনতে পেরেছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু নির্জন বন্দিশালায় সেই ডুগডুগি তিনি বাজাতেন কিনা সে কথা ইতিহাসে লেখা নেই।